অমর প্রেম

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার,
দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

দাম দেড় টাকা]

প্রিণ্টার—রাজেন্দ্রলাল সরকার
কাত্যায়নী প্রেস
৩৯।১ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত অবনিমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

করকমলেষু—

বাল্যে ও যৌবনে তোমার যে স্নেহ লাভ করিয়াছি এবং এখনও যাহা সর্ব্বক্ষণ অনুভব করিতেছি তাহা মনে করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি তোমাকে দিলাম।

আরঙ্গাবাদ (গয়া)
২৫এ অগ্রহায়ণ—১৩৩৮

স্নেহানুগত
শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

অসহ্য প্রেম

[১]

সুলাসপুর গণ্ডগ্রাম। কলিকাতা হইতে রেলে ঘণ্টাখানেকের পথ। গ্রাম হইতে ষ্টেশনে আসিতে মিনিট কুড়িও লাগে না। আর এ গ্রামে ডেলি প্যাসেঞ্জারেরই সংখ্যা বেশী। গ্রামখানি বেশী বড় না হইলেও গ্রামে একটী হাইস্কুল, একটী মেয়ে পাঠশালা, একটী ছোটখাটো হাসপাতাল—এমন কি একটি ছোট লাইব্রেরী পর্য্যন্ত আছে।

শরতের অপরাহ্ন। আকাশে খণ্ড খণ্ড লঘু মেঘ যেন ছোট ছোট নৌকার মত ভাসিতেছে। অল্প কিছু পরেই সন্ধ্যা নামিয়া আসিবে। রৌদ্রের উত্তাপটুকু দূরে গিয়া শান্ত হিমে এখনি ধরণী শীতল হইবে।

সুহাসিনী বড় মেয়েকে ডাকিয়া বলিল—লতু, যাতো মা, খোকাকে আর রথিকে নিয়ে একটু ওদের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে নিয়ে আয়। আমি ততক্ষণ—খাবারটা করে নিই।

লতুর—ভাল নাম লতিকা; বয়স ১৬ বৎসর। বলিল, ওদের বাড়ী

লতা রাগ করিয়া বলিল, যাবিনে তো সবাইকে নিয়ে আমি একলা

কি করে করব। এখনি সবাই হা হা করে এসে পড়ল বলে। তোদেরই ত পেটের জ্বালা ধরেছে। সবাইকে কি গিল্‌তে দেব শুনি ?

মেয়েও একটু রাগ করিয়া বলিল—তা বলে বুঝি আমি রোজ রোজ ওদের বাড়ীতে পড়ে থাক্‌ব। আমি পার্‌ব না।

মা ঝঙ্কার দিয়া কহিল, কেন পারবে না শুনি—কি নবাবের মেয়ে হয়েছ তুমি যে এতটুকু তোমায় দিয়ে হবে না।

মেয়ে এবার সত্যই রাগিয়া গেল। বলিল, তুমি কেন আমার বাপ তুল্‌বে আমি যাব না।

মা বলিল, আ-মর, একে বাপ তোলা বলে; তা যদি বলেতো বেশ করিছি তুলিছি। ভাল চাস্‌ তো শীগ্‌গির নিয়ে যা—ওঠ্‌।

মেয়ে তবু খুঁটির মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল। মা মেয়ের পিঠে খুব জোরে গোটা কয়েক চড় বসাইয়া দিয়া বলিল—যা রাক্কুসী, বেরো শীগ্‌গির আমার সুমুখ থেকে—যা দূর হয়ে যা।

মেয়ে মার খাইয়া একটুও শব্দ করিল না। কিন্তু এক বৎসরের খোকাটিকে কোলে লইয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। ছোট বোনটির বয়স ৪ বৎসর;—সে মাতৃসন্নিধি এ সময় নিরাপদ মনে না করিয়া ধীরে ধীরে দিদির অনুসরণ করিল।

লতিকা কাহারও বাড়ী গেল না। বাহিরে আসিয়া প্রথমে সে চোখ দুটা বেশ করিয়া মুছিয়া লইল; তারপর বাহিরের রোয়াকে ভাইকে কোলে করিয়া বসিল। বোন্‌ যূথিকাও আসিয়া একটু

ভয়ে-ভয়ে তাহার পাশে বসিল। লতিকা তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল—কিচ্ছু বলিল না।

সেজ মেয়ে কণিকা মেয়ে-স্কুলে পড়ে। ৪টা বাজিবার একটু পরেই সে বই শ্লেট লইয়া শুষ্কমুখে ফিরিল। তাহার বয়স ১১ বৎসর। ঘরে ঢুকিয়াই বই শ্লেট কুলুঙ্গিতে ফেলিয়া সে বলিল—মা, বড্ড খিদে লেগেছে, কিচ্ছু হয় নি?

বলিয়া ক্ষুধিত দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল।

সুহাসিনী মেয়ের শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে আর রূঢ় কথা বেশী বলিতে পারিলেন না। কিন্তু রাগটুকু যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া বলিলেন, কি করে হবে খাবার। নিজে তো আর চারখানা হাত বের করতে পারিনে। লতিকে আমি কতক্ষণ থেকে বল্‌ছি—যা ওদের নিয়ে একটু বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আয়, আমি ততক্ষণ খাবারটা করে নিই। তা মেয়ের বয়ে গিয়েছে সে কথা শুন্‌তে। শেষে ঘা কতক খেয়ে ওদের বাড়ী গেল।

কণিকা বলিল, দিদিতো ওদের বাড়ী যায় নি। বাহিরের রোয়াকে বসে রয়েছে যে। দাও, আমায় দাও আমি রুটি বেলে দিচ্ছি। রোসো হাত-পাটা ধুয়ে আসি।

বলিয়া কণিকা চট্ করিয়া হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া রুটি বেলিতে বসিয়া গেল।

রুটি বেলিতে বেলিতে কণিকা বলিল, দিদি ওদের বাড়ী যায়নি ভালই হয়েছে। ওরা কেমন ধারা লোক।

রুটি সেঁকিতে সেঁকিতে সুহাসিনী বলিল—কেন ওরা কি কল্লে?

কণিকা বলিল, পরশু দিদি আর আমি খোকাকে নিয়ে ওদের বাড়ী গিয়াছিলাম, তা বাঁড়ুয্যে গিন্নি বলে কি জান মা? বলে এত বড় মেয়ে হাত-খালি কেন রে? তোর মা-বাপের কি দুগাছা বাধান শাঁখাও জোটে না যে হাতে দিয়ে রাখে। দিদিতো শুনেই রেগে খোকাকে নিয়ে দুর্ দুর্ করে চলে এলো। আমি আস্‌বার সময় বলে এলাম—তাতে আর আপনাদের কি ক্ষতি হয়েছে? আপনাদের কাছে ত চাইতে যাচ্ছিনে!

সুহাসিনী এ সব কথা কিছুই জানিত না। এ পর্য্যন্ত শুনিয়া সে একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল—তারপর কি বল্‌লে গিন্নি?

কণিকা হাসিয়া বলিল,—তা বেশ ভালই বল্‌লে না। বল্‌লে, বাবা! মেয়ে তো নয়, যেন কেউটে সাপ!

সুহাসিনী রাগের সঙ্গেই মুখে বলিল—তুই বেশ করেছিলি বলেছিলি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখ দুটো সজল হইয়া আসিল। মনে হইল—হায়, কি অদৃষ্ট করিয়াই আসিয়াছিলাম যে মেয়েদের হাতে দুগাছা করিয়া কাঁচের চুড়িও দিতে পারেন না। লোককে ভগবান্ বল্‌তে দিয়েছেন—বল্‌বেই তো। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল—তাহা হইলে নতুর তো কোন দোষ নাই। বিনাদোষে মেটেটা মার খাইল। অথচ এমন মেয়ে—কেন ওদের বাড়ী যাইবে না সে কথা তাহাকে বলিল না—চুপ করিয়া মার খাইয়া বাহিরে গেল।

সুহাসিনীর চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। কণিকা রুটি বেলিতে বেলিতে মায়ের দিকে চাহিল। রুটি বেলা বন্ধ রাখিয়া—

মায়ের কাছে সরিয়া ছল্ ছল্ চোখে মাকে জিজ্ঞাসা করিল—কাঁদ্‌ছ কেন মা? কি হয়েছে?

সুহাসিনী তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া ভারি গলায় বলিল—লতুকে একবার ডেকে নিয়ে আয় তো মা শীগ্‌গির। বল্ আমি ডাক্‌ছি।

কথিকা উঠিয়া গেল। একটু পরেই খোকাকে কোলে লইয়া লতিকা কথিকার সঙ্গে ফিরিয়া আসিল। লতিকা আসিয়া মায়ের কাছ হইতে একটু দূরে দাঁড়াইল।

সুহাসিনী বলিলেন—লতু, সরে আয় তো মা কাছে। লতিকা সরিয়া আসিল।

সুহাসিনী বলিলেন—আমার কাছে বোস্।

লতিকা বসিল।

সুহাসিনী লতিকার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, বড্ড লেগেছে মা! তা আমাকে বলিস্ নি কেন যে বামুন গিন্নি তোকে এ কথা বলেছে, তোদের মেরে, কি গালি মন্দ দিয়ে আমিই কি সুখে থাকি মা!

লতিকা প্রায় বিনাপরাধে—মায়ের কাছে মার খাইয়াও কাঁদে নাই; কিন্তু মায়ের মিষ্টি অনুতপ্ত বাক্যে সে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সুহাসিনী রান্না ছাড়িয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে লতিকাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন।

[২]

সুহাসিনীর শ্বশুরবাড়ী কাঁচড়াপাড়ার কাছাকাছি দুর্গাপুর গ্রামে। সুহাসিনীর সঙ্গে যখন মনোহরের বিবাহ হয়, তখন মনোহর বি-এ পড়ে। সেই বারই সে বি-এ পাশ করিল। মনোহরের শ্বশুরবাড়ীর সকলেই—তাহার সঙ্গে সুহাসিনীও আশা করিয়াছিল যে স্বামী বেশ একটা ভাল রকমের চাকরির যোগাড় করিবে। সুহাসিনী সব সময়ই কল্পনা করিত দূরদেশে পশ্চিমে বেশ ভাল জায়গায় স্বামী বড় চাকরি করিবে; সে ঘরের গৃহিণী হইয়া বসিবে; ঝি চাকরে সংসারের মোটামুটি কাজ সব করিবে, সে শুধু সব গুছাইয়া রাখিবে, সংসারের সুব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখিবে, স্বামীর জন্য জলখাবারটি করিবে, স্বামীর কারপেটের জুতার উপর ফুল তুলিয়া দিবে, সূচিশিল্পে দুইচারিটি প্রবচন লিখিয়া ছবি তুলিয়া স্বামীর বসিবার ঘরে ও নিজেদের শোয়ার ঘরে টাঙ্গাইয়া রাখিবে। কাহার হাতের এ সব কেউ জিজ্ঞাসা করিলে স্বামী বেশ একটু গর্ব্বিত হাস্যের সহিত বলিবেন—আমার স্ত্রীর। মেয়েরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে কি জানি। তারা আরো বলিবে তোমারই হাতের বুঝি? বেশ হয়েছে! সে বলিবে—ভারি তো বেশ। আগে জানতাম, এখন সব প্রায় ভুলে গেছি।

বাপের বাড়ীতে সুহাসিনী শিল্প কাজ, শেলাই, বাংলা লেখাপড়া

মোটামুটি বেশ ভালই শিখিয়াছিল। তাহার গলা বেশ মিঠে বলিয়া বাপ যত্ন করিয়া গান গাহিতে শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া দেখিল সে সব বড় একটা কাজে আসিতেছে না। বাসন মাজা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, রান্না করা ইত্যাদি যে সব কাজ সে যেমন তেমন করিয়া শিখিয়াছিল, তাহারি দাম শ্বশুরবাড়ীতে বেশী হইল। ক্রমে ঘর সংসারের কাজের মধ্যে শিল্প কার্য্যাদি কোথায় ভাসিয়া গেল। একদিন লুকাইয়া গুন্ গুন্ করাতে শ্বশুরবাড়ীতে এমন এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল যাহার ফলে সে যে কখন গান গাহিতে পারিত সে কথা সে নিজের কাছেও লুকাইয়া ফেলিল।

এমন সময় মনোহর বি-এ পরীক্ষাটা দিয়া বাড়ী আসিল। সে দিনের বেলায় বাহিরে গল্পগুজব করিয়া বন্ধুবান্ধবদের বাড়ী ঘুরিয়া রাত্রেও ১০টা অবধি খেলিয়া বাড়ী ফিরিত; আহারাদির পর রাত্রি ১১টা ১২টার পর কখন বা স্ত্রীকে লইয়া কাব্য করিবার চেষ্টা করিত। সমস্ত দিন খাটিবার পর বেশী দিনই সে ঘুমাইত। কখন বা কাব্যটুকু উপভোগ করিবার চেষ্টা করিত। মনোহর কখনও বা অনুযোগ করিত, আজকাল সে পড়ে না কেন? তখন তাহার ঠোঁটের আগায় উত্তর আসিত, তোমাদের সংসারের যে বাসন মাজিতেই ও ঘর ধুইতেই আমার সব সময় কাটিয়া যায়, পড়িবার সময় আর কোথায় পাইব? কিন্তু তাহা না বলিয়া সুধু তাহার বড় বড় চোখ মেলিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া থাকিত, কখন বা অনিচ্ছায় একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িত। মনোহর জিজ্ঞাসা করিত "রাগ করিলে নাকি", সে মৃদুস্বরে বলিত 'না'।

একদিন সুহাসিনী বহুকাল অপঠিত একখানি পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিয়াছিল, তাহার ফলে ভাত ধরিয়া গিয়াছিল এবং বড় যা বলিয়াছিল,

গরীবের ঘরে মেমসাহেবের মত বই পড়িলে চলিবে না। ইহার পর সুহাসিনী আর সে চেষ্টা করে নাই।

সুহাসিনীর শ্বশুর তখন জীবিত। তিনি জমিদারী সেরেস্তায় টাকা কুড়ি বেতনে কাজ করিতেন। সুহাসিনীর ভাসুর মার্চেণ্ট আফিসে ৬০৲ টাকা মাহিনা পাইত। তখন ভাসুরের মাত্র দুইটি ছেলে হইয়াছিল—সংসারও তেমন বড় ছিল না। বিপত্নীক শ্বশুর, ভাসুর, বড় যা ও তাহার দুই তিনটি ছেলেমেয়ে। ভাসুরের টাকায় সংসার চলিত, শ্বশুরের টাকায় মনোহরের পড়া চলিত। একটা প্রাইভেট মেসে থাকিয়া সে পড়িত বলিয়া ইহাতেই একরকমে চলিয়া যাইত। কখন কিছু কম পড়িলে দাদার কাছ হইতে মনোহর চাহিয়া লইত। সকলেরই আশা হইল, মনোহর বি-এ পাশ করিয়া একটা বড়গোছের কাজ পাইবে।

মনোহর পাশও করিল; কয়েকদিনের জন্য কিছু সম্ভ্রমও বাড়িল। সুহাসিনী পর্য্যন্ত তাহার কিছু ভাগ পাইল, কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না।

চাকরি পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। কথায় বি-এ পাশ যুবকের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইতেও বাধা নাই, কিন্তু কার্য্যকালে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের একটা ছোট কেরাণীর পদও দুর্লভ। অনেক চেষ্টা করিয়াও সুবিধামত তাহার কোন চাকরিই জুটিল না। সব্‌ডেপুটি সবরেজিষ্টার, সব-ইনস্পেক্টারের পদের জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিন্তু কিছুতেই সে যোগাড় করিতে পারিল না। শেষে ডাকঘরে ঢুকিবার চেষ্টা করিয়া জানিল, বর্ত্তমানে খালি নাই, খালি হইলে সংবাদ দেওয়া হইবে। সে সংবাদ আর আসিল না।

মনোহরের দাদা একদিন আসিয়া সংবাদ দিল যে, তাহাদের আফিসে একটা ৩০৲ টাকার চাকরি খালি আছে। গ্রাজুয়েটকে এ পদ দিবার

ইচ্ছা সাহেবের ছিল না, তবে অনেক চেষ্টায় সাহেবকে ব'লে ক'য়ে রাজী করিয়াছি, কিন্তু কালই হাজির হইতে হইবে, নহিলে পাওয়া যাইবে না।

মনোহরের সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। বি-এ পাশ করিয়া এত আশা ভরসার পর শেষে মাত্র ৩০৲ টাকার একটা চাকরি!—তাও মার্চেন্ট আফিসে! আর এমন মার্চেন্ট আফিসে, যেখানে তাহার দাদা এণ্ট্রান্স ফেল করিয়া ঢুকিয়া আজ ৬০৲ টাকা মাহিনা পাইতেছে। সে খুব জোরের সহিত বলিল, আমি এ কাজ কিছুতেই করিব না। তাহার দাদা বলিল, বসিয়া থাকিলে যদি চলে অর্থাৎ নিশ্চিন্ত আহার পাওয়া যায় লোকে কেন খাটিতে চাহিবে? কথাটা অনেকটা সাধারণভাবেই বলা হইয়াছিল; কিন্তু মনোহর কথাটা বিশেষভাবেই প্রযুক্ত বলিয়া মনে করিল। এই লইয়া দুই ভাইয়ের মধ্যে বেশ একটু মন কষাকষি হইয়া গিয়াছিল। এমন সময় মনোহরের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। উহার কিছু পরেই মনোহরের পিতার মৃত্যু হইল। শ্রাদ্ধাদির মাস কয়েক মধ্যে সহজেই প্রতীয়মান হইল যে, পিতার মৃত্যুতে সংসারের আয় কমিয়াছে এবং কন্যার জন্মগ্রহণে কিছু খরচ বাড়িয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়িবার সম্ভাবনা হইয়াছে। বধূ হইয়া আসিয়া অবধি সুহাসিনীকে যায়ের সঙ্গে সমান করিয়া সংসারের কাজ করিতে হইত। আজকাল তাহার একটু বেশী কাজই পড়িল। স্বামীর বেকার অবস্থা ও শ্বশুরের মৃত্যুর ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল ভাবিয়া—মুখ বুজিয়া সুহাসিনী সে সব কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। তথাপি মাঝে মাঝে অগ্ন্যুৎপাত হইতে লাগিল।

এইভাবে দুই বৎসর কাটিয়া যাইবার পর কাঁচড়াপাড়ার স্কুলে একটি শিক্ষকের পদ খালি হইল। তখনকার হেডমাষ্টারের ঐ স্কুলেই সে ছাত্র ছিল; তদুপরি সে স্থানীয় লোক বলিয়া তাহাকেই নিযুক্ত করা হইল।

বেতন হইল কিন্তু মাসিক ত্রিশটি টাকা। তাহার দাদা বলিল—হতভাগাটা যদি আমাদের আফিসে সে চাকরিটা লইত তাহা হইলে আজ ৫০৲ টাকা মাহিনা হইত। এখন তো সেই ৩০৲ টাকা ভাল লাগিল। শুনিয়া মনোহর চুপ করিয়া রহিল।

মাস দুয়েক সংসারে একটু শান্তি রহিল। এই সময়ে সুহাসিনী আর একটি কন্যা প্রসব করিয়া গোলযোগ আবার বাড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে মনোহরের কিছু বেতন বাড়িলে বোধ হয় গোলযোগ তত হইত না। কিন্তু তাহা না হওয়ায় গোলযোগ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল। শেষে দুই ভাইয়ে কথাবার্ত্তা প্রায় বন্ধ হইয়াই আসিল—যদিও তাহার চতুর্গুণ কথাবার্ত্তা দুই ভ্রাতার স্ত্রীর মধ্যে আদান প্রদান হইতে লাগিল। ক্রমশঃ শান্তিপ্রিয়া সুহাসিনী কলহ-নিপুণা হইয়া উঠিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া মনোহর বড়ই ব্যথিত হইত। স্ত্রীকে কিছু অনুযোগ করিতে গেলে সে বলিত,, তুমি মাহিনা কম পাও বলিয়া ত আমি গতর দিয়া পোষাইয়া দিতেছি। ঝি বামুনের কাজ একাই করিতেছি। তবুও যদি দিনরাত্রি বাক্যযন্ত্রণা সহিতে হয় তো মানুষ কত সহিতে পারে!

এক রাত্রে সুহাসিনী সাশ্রুনেত্রে বলিল, তুমি বিদেশে একটা ২৫৲ টাকার চাকরি যোগাড় করিয়া আমাকে লইয়া চল—আমি মেয়েদের ভাতের মাড় খাওয়াইয়া নিজে এক বেলা খাইয়া থাকিব, সেও আমার ভাল; তোমার দুটী পায়ে পড়ি।

এই সময়ে মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে মনোহর সুবাসপুর হাই স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ যোগাড় করিয়া লইল ও সপরিবারে সেখানে চলিয়া গেল। সে আজ ১২।১৩ বৎসরের কথা। সুবাসপুরে

আসিয়া এই কয় বৎসরে তাদের দুইটি ছেলে ও একটি মেয়ে হইয়াছে। কণিকা বার বৎসরের, ছেলে রামপ্রসাদের বয়স ৯ বৎসর, ছোট মেয়ে যূথিকা ৬ বৎসরের—খোকা বৎসরখানেকের। যূথিকা ও খোকার মাঝে আর একটি শিশু আসিয়াছিল, কিন্তু কয়েক দিনের বেশী আর সে পৃথিবীতে থাকে নাই।

কিন্তু যে সুখের আশ্বাসে সুহাসিনী বিদেশে আসিয়াছিল সে সুখ কি সে পাইয়াছিল ?

বেলা ৬টা আন্দাজ মনোহর রামপ্রসাদকে লইয়া বাসায় ফিরিল। রামপ্রসাদ সেই কখন বেলা ১০টায় তাড়াতাড়ি দুটি ভাত খাইয়া গিয়াছিল—আর সমস্ত দিনটা কিছু খায় নাই ; ক্ষুধায় মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি জুতা জামা খুলিয়া ফেলিয়া বইখানি একটা কুলুঙ্গিতে রাখিয়া বলিল, মা, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে—শীগ্‌গির কিছু খেতে দাও না।

বলিয়া চট্ করিয়া হাতে মুখে জল দিয়া মায়ের কাছে আসিয়া বসিল।

মনোহর পাশের ঘরে যাইয়া একখানি পাখা লইয়া আস্তে আস্তে বাতাস খাইতে লাগিল।

সুহাসিনী দুখানা রুটি ও একটু তরকারি ছেলের সম্মুখে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—স্কুলে খাবার কিছু খাসনে কেন ? সেই কোন্ সকালে খেয়ে যাস্ !

নয় বৎসরের ছেলে এক টুকরা রুটি মুখে পূরিয়া বেশ বিজ্ঞের মত বলিল, খিদে তো তেমন লাগে না ; বাবা খেতে বলেন রোজ, আমি খাইনে।

সুহাসিনী একটু বিরক্তির সহিত বলিল, ভারি কাজ কর, বাপের সাশ্রয় কর। খেলেই তো পয়সা খরচ হবে।

রামপ্রসাদ বলিল, বাবা তো আমাকে খেতে বলেন মা।

সুহাসিনী বলিল—সে যা বলে তা বুঝ্‌তেই পাচ্ছি। তুই যেমন ছেলে তেমনি থাক্ দিখি। তোর আর ঢাক্‌তে হবে না।

মনোহর ভিতর হইতে একটু রুক্ষস্বরে বলিল, কেন লুকাতে যাবো বলো। এতো আর খুন জখম কিছু করা হয় নি যে ঢাকার দরকার হবে।

সুহাসিনী তৎক্ষণাৎ বলিল, তোমার যা কাজ খুন জখমের চেয়েও বেশী। এইটুকু ছেলে সেই ১০টায় এক মুটো খেয়ে গিয়েছে, আর এখন সন্ধ্যা হতে চল্‌ল এখন পর্য্যন্ত পেটে কিছু পড়ল না। তা একে ৬টা পর্য্যন্ত বেঁধে না রেখে ৪টার পর যেমন সবাই আসে তেমনি একেও আস্‌তে ছেড়ে দিলে হয়।

মনোহর হাত হইতে পাখাখানি নামাইয়া রাখিয়া বলিল, ছুটির পর ওকে তো আমার কোন কাজের জন্য আট্‌কে রাখিনে। ছেলেরা ছুটির পর পড়ে, এও বলে আমিও পড়ে তবে যাব। তাই ওকে আর জোর করে টেনে পাঠাইনে।

সুহাসিনী তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, আর অত লেখা-পড়ায় কাজ নেই। তুমি লেখা-পড়া শিখে যত করছ—তোমার ছেলেও তত করবে।

মনোহর বলিল, আমি সত্যি করে লেখাপড়া শিখিনি তাই আমার মধ্যে শক্তি জন্মায় নি, কি উচিত কি অনুচিত সে জ্ঞানও হয় নি—নিজে কিছু না বুঝে পরের কথা মত কাজ করে এসেছি; তাই আজ ফল পাচ্ছি। ও যাতে প্রকৃত লেখাপড়া শিখ্‌তে

পারে সেইজন্য একটু চেষ্টা কর্‌ছি, তোমার কথায় ত সে চেষ্টা ছাড়্‌তে পারিনে।

সুহাসিনী বলিল, আমার কথামত তুমি চিরদিন চ'লে এসেছ তাই আজ তোমায় চল্‌তে বল্‌ব। তা যদি চল্‌তে তাহ'লে তোমার এত দুর্দ্দশা হ'ত না, আমিও এমন ক'রে বয়ে যেতাম না, আর লোকের কাছে আমাদিগকে লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে থাক্‌তে হ'ত না। এত বছর কাজ্ কর্‌ছ—তুমি বি-এ পাশ করেছ, মুক্ষুও নয়; এত বড় মেয়ে তোমার ঘরে—তাদের দু'হাতে দু'গাছা বাঁধান শাঁখা দেবারও তোমার ক্ষমতা নাই!

এতক্ষণে আসল কথাটা আসিয়া পড়িল।

তাতে কি হয়েছে?—মনোহর ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে বলিল।

সুহাসিনী খুব উচ্চ কণ্ঠে বলিল, "হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। লোকে যে ছিঃ ছিঃ করে। পাশের বাড়ীর লোকেরাই যে কত কথাই বলে। বলে বাপ-মার এমন ক্ষমতা নেই যে দু'হাতে দু'গাছা কিছু দেয়।

মনোহর বলিল, তা মেয়েদের ওদের বাড়ী যেতে দাও কেন? না যেতে দিলে কথা শুন্‌তে হয় না।

সুহাসিনী। তুমি তো বেশ বলে যেতে দাও কেন? দুধ তো নাও একসের, সে তো তোমার সকালের চা ক'রে খোকাকে দুবার খাওয়াতেই শেষ হয়ে যায়।

তারপর তোমার বার্লি দুধটা ধ'রে সেদ্ধ হবে—তবে তো গিল্‌তে দেব। ততক্ষণ যে কেবল রান্নার ঘরের দিকে দেখিয়ে দেবে আর কাঁদবে

তবুও পরের বাড়ী গিয়ে অন্য ছেলেপুলের সঙ্গে দুদণ্ড স্থির হয়ে থাকে। ও বাঁচে আমিও বাঁচি।

মনোহর। তাহ'লে বালি একটু সময় মত ক'রে রাখলেই পার। তুমি সময় মত কাজ করবে না তাও আমার দোষ হবে?

সুহাসিনী। না আমারি দোষ। রান্না, বাসনমাজা, জলতোলা সবই প্রায় একহাতে করছি। তবুও আমার নিস্তার নেই। মেয়েটাকে দিয়ে একটু কাজ পাব তারও উপায় নেই। একটা স্কুলে প'ড়ে আমার মাথা কিনছে; আর একজনতো খোকাকে নিয়ে আছে, একটু সময় পেলেই বই খুলে বসছে—নইলে তোমার আবার শাসন আছে; পড়া বলতে পারা চাই। তুমি লেখাপড়া শিখে সংসারের সব দুঃখ ঘোচালে—এখন তোমার মেয়েরা বাকি আছে।

মনোহর। তোমার কথাগুলো বড় কর্কশ হচ্ছে দিন দিন। ও লেখাপড়ার কথা নিয়ে ঘা না দিয়ে তুমি কথা বলতে জান না। এ তুচ্ছ লেখাপড়া জানে না অথচ অগাধ জমিদারী আছে দেখে যদি বিয়ে করতে, তুমিও বাঁচতে—আমিও বাঁচতাম। এখন তার জন্য আপশোষ ক'রে কি হবে!

কথা বলিতে বলিতে একটা গভীর দুঃখ তাহার মনোমধ্যে সঞ্চিত হইয়া উঠিল। ৪টা পর্য্যন্ত স্কুলে খাটিয়া তারপর ছুটির পর কয়েকটি ছেলেকে স্কুলের একটা ঘরে বসিয়া প্রাইভেট পড়াইয়া সন্ধ্যার সময় সে বাড়ী ফিরিল, আর তার স্ত্রী তুচ্ছ কথা লইয়া তাহাকে আঘাত দিয়া কথা কহিতে লাগিল। এই সংসার! এই সংসারের সুখ! ইহাই দাম্পত্য প্রেম!

বসিয়া বসিয়া এ বাদানুবাদ মনোহর আর সহ্য করিতে পারিল না। উঠিয়া আল্না হইতে একটা কামিজ টানিয়া লইয়া গায়ে দিল ও তালি লাগান জুতা জোড়াটি পরিল। তারপর কক্ষত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সেখান হইতে শুনিতে পাইল সুহাসিনী বলিতেছে—ডেকে বল না, খেতে হবে না! খাবার দেওয়া হচ্ছে। রামপ্রসাদ খাওয়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—বাবা! খাবার দেওয়া হয়েছে, এস।

মনোহর ততক্ষণ বাড়ীর বাহির হইয়া গিয়াছিল।

সুহাসিনীর বার বার তাহার লেখাপড়াকে লক্ষ্য করিয়া তাচ্ছিল্যের কথা মনোহরকে কঠিনভাবে আঘাত করিয়া তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাতে আর তাহাকে স্থিরভাবে থাকিতে দিতেছিল না, মনোহর তাই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

বাড়ীর সম্মুখেই যে রাস্তা তাহা উত্তর দিকে ২।৩টা বড় বড় আমবাগানের মধ্য দিয়া বরাবর সোজা নদীর ধারে গিয়াছে, মনোহর সেই পথ ধরিল। তাহার যেন কিছুক্ষণের জন্য ভাবনা চিন্তা লোপ পাইয়াছিল। লোকে যেমন সময়ে সময়ে কোন জিনিসের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকে, আর কোন দিকে তাহার দৃষ্টিও থাকে না—চিন্তাও থাকে না, মনোহরের চিত্তে সেইরূপ কেবলমাত্র একটী কথা জাগিতেছিল, তাহা সুহাসিনীর কঠিন তাচ্ছিল্য। তাহার সমগ্র হৃদয় যেন বড় বড় চক্ষু মেলিয়া তাহার প্রতি, তাহার অধীত বিদ্যার উপর স্ত্রীর বিপুল তাচ্ছিল্যের দিকে চাহিয়াছিল। মনোহর অর্দ্ধেক পথ আসিতেই সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। তখন একটি

ছাত্র বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। এই সময়ে শিক্ষককে নদীর ধারে যাইতে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—স্যার, এখন কোথায় যাচ্ছেন ?

প্রথম বার মনোহর শুনিতেই পাইল না। দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করিতে মনোহর চমকিয়া—তাহার পানে চক্ষু ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বলছ ?

ছাত্রকে তৃতীয় বার কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে হইল। তখন মনোহর বলিল—এই একটু বেড়াতে যাচ্ছি।

ছাত্রটী একটু বিস্মিত ভাবে শিক্ষকের পানে চাহিয়া রহিল। কিছু বলিল না।

ক্রোশ খানেক দূরেই গঙ্গা। মনোহর ধীরে ধীরে গঙ্গার ধারে গিয়া পৌছিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি হইয়াছে।

মনোহর গঙ্গাতীরে বসিয়া আপন অদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিল।

সংসারে এতগুলি পরিবার কিন্তু আয় মাত্র ৫০৲ টাকা। ৪০৲ টাকা স্কুলে আর ১০৲ টাকা স্কুলের ছুটির পর কয়েকটি ছেলে প্রাইভেটে পড়াইয়া। সে দশটাকা বাড়ী ভাড়াতেই চলিয়া যায়। বাকি ৪০৲ টাকাতেই সব করিতে হয়। যে মাসে ডাক্তার ও ঔষধের খরচ ১৫।২০৲ টাকা পড়িয়া যায়, সে মাসে ধার করিয়া সংসার চালাইতে হয়। তারপর সেই ধার শুধিতে কয়েক মাস কাটে। ধার শোধ হয় বটে, কিন্তু তাহা পেটের উপর বাণিজ্য করিয়া। সে কয়মাস, সত্য কথা বলিতে কি, ছেলে-মেয়েদের জলখাবার জোটে না। কি লজ্জার কথা !

কিন্তু সে তো বসিয়া থাকে না। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমান খাটে। রাত্রিটা কেবল ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্য রাখে ; আর তাহাও তো দরকার। কিন্তু এত করিয়াও তো কিছু হইল না। না রহিল সুখ,

অমর প্রেম

না রহিল শান্তি। প্রেম ভালবাসা কাব্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। হয়ত বা বড় লোকের ঘরে থাকিতে পারে। কিন্তু দরিদ্রের ঘরে তাহা দুর্লভ। গাছপালার জীবনের পক্ষে যেমন সূর্য্যের আলোক ও জলের ধারার প্রয়োজন, প্রেমের মূলেও তেমনি কাঞ্চনের পরশ চাই—না-হলে গাছপালার মত প্রেম শুকাইয়া যায়। নইলে সেই সুহাসিনী এত গর্ব্বিত কি করিয়া হইল? সে কিনা [illegible] সামনে বলিয়া বসিল—লেখাপড়া শিখিয়া তুমিও যত করছ তোমার ছেলেও তত করবে। আমি সেই সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিয়া পেটে ক্ষুধা লইয়া ফিরিলাম—সে কথা তাহার মনেও হইল না!

আজ যদি আর বাড়ী না ফিরিয়া দূর—দূর—অতিদূর দেশে চলিয়া যাইতে পারিত! তারপর বহুবৎসর পরে প্রচুর টাকা লইয়া ফিরিতে পারিত, তাহা হইলে ইহার উপযুক্ত উত্তর হইত। কিন্তু সে উপায় যে নেই। নিশ্চিত অনাহারের মুখে উহাদের ফেলিয়া দিয়া কি করিয়া সে এখন কোথাও যায়! তাহা হইলে কাল যে তাহার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাকে পথে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়। তারপর অনাহারে মৃত্যু! কি ভীষণ অবস্থা! লতিকার বয়স ১৫ বছর হইয়া গিয়াছে—তাহারই বা বিবাহ কি করিয়া হইবে! মনোহর বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। শেষে স্থির করিল বাড়ী ফিরিতেই হইবে। কিন্তু উপার্জ্জনও ত দরকার, এবং তাহা করিতেই হইবে। যদি কিছু অর্থ উপায় করিতে পারে—তবে এই অর্থের ভিতর দিয়া সে স্ত্রীর উপর এই তাচ্ছিল্যের প্রতিশোধ লইতে পারিবে। গাঢ় অন্ধকারে নদীর দুইধার ছাইয়া গেল। এ পারের তীরের বনে ঝিল্লি ডাকিয়া ডাকিয়া যেন শ্রান্ত হইয়া চুপ করিল। অন্ধকার আকাশের উজ্জ্বল তারকাগুলি কালো আঁখির তারার মত জাগিয়া [illegible]।

এ দিকে গৃহকোণে সুহাসিনী হাতে কাজ করিতেছিল ও মনে মনে ভাবিতেছিল, চিরকালই তাহার কষ্টে গেল। যতদিন বৌ হইয়া শ্বশুর-বাড়ীতে ছিল ততদিন রাঁধুনি ও ঝিয়ের মত দিবারাত্রি খাটিতে হইয়াছে, এখানে স্বাধীনভাবে থাকিয়াও দুঃখ ঘুচিল কই? নুন আনিতে পান্ত ফুরায়—এ কোনদিনই ঘুচিল না। কথায় কথায় মুখে লাগিয়াই আছে, আমি কি আর ব'সে আছি, আমি কি দিন রাত্রি খাটছিনে। আর সেই বা কি ব'সে আছে! সমস্ত দিন রাত্রি আলো নেই—বাতাস নেই—সব সময়ে ঘরের মধ্যে বন্ধ। আর ছেলেপুলের সঙ্গে বকিতে বকিতে প্রাণ অন্ত। কি সুখেই তাহাকে রাখিয়াছে! তার উপর—একটা কথা মুখের উপর আনিলেই রাগ। তাহাকে যেন দাসী বাঁদী রাখিয়াছে যে, মুখ বুজিয়া চিরটাকাল খাটিয়া যাইতে হইবে। একটা কিছু বলিলে সর্ব্বনাশ। না খাইয়া রাগ দেখান হইল। তা দেখাক্—সেও রাগ করিতে জানে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাগের ঝোঁকে এক আধটা কথা মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল। চোখ দিয়া দুই চারি ফোঁটা জলও আসিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু রাগের বশে চোখের জলকে সে আমলই দিতেছিল না।

রাত্রি ৮টা হইয়া গেল; তখনও মনোহর ফিরিল না। লতিকা বলিল—মা, বাবা তো এখনও এলেন না।

সুহাসিনী ঝাঁঝের সহিত বলিল—না এল তো আমি কি করব? আমি তো এখন মাথায় কাপড় বেঁধে তার খোঁজে যেতে পারিনে।

মুখে এই কথা বলিলেও মনে মনে সুহাসিনী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল। লতিকা জিজ্ঞাসা করিল রামুকে নিয়ে আমি একবার খুঁজতে যাব?

সুহাসিনী বলিল কোথায় যাবি? খুঁজতে বাবার কি একটা চুলো আছে!

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিয়া গেল।

সুহাসিনী মনে ক্রমশঃ অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষে চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—কিসে ছেলেমেয়ে পরিবার সুখে শান্তিতে থাক্‌বে সে চেষ্টা তো নেই—থাকবার মধ্যে আছে পুরুষের লক্ষণ রাগ। আমায় যেমন বিনাদোষে কষ্ট দিচ্ছে এ কষ্ট তোলা থাক্‌বে।

সঙ্গে সঙ্গে চোখের জলটা মুছিয়া ফেলিল।

এমন সময় মনোহর ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিল। চোখের জলটা সে দেখিতে পায় নাই, কথাটা শুনিতে পাইয়াছিল। মনে মনে সে যে সংকল্প করিয়া আসিয়াছিল ইহাতে সে সংকল্প দৃঢ়তর হইল; তাহার দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর খুলিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

[৩]

পরদিন সকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়াই মনোহর বাহির হইল। লতিকা চায়ের জল চড়াইয়াছিল। পিতাকে এত সকালে বাহির হইতে দেখিয়া লতিকা বলিল—বাবা, চা খেয়ে যাও, এখনি হয়ে যাবে।

মনোহর বলিল—আজ আর আমি চা খাব না মা! শরীরটা ভাল নেই। তোমরা খেও।

বাবা চলিয়া গেলে লতিকা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চায়ের কেট্‌লি নামাইয়া রাখিল। বাপের অসুখ যে শরীরে নয়, মনে—তাহা লতিকা বুঝিয়াছিল।

সুহাসিনী কাপড় কাচিয়া রান্নাঘরে ঢুকিতে লতিকা বলিল—মা, বাবা আজ চা খান্‌নি।

সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

লতিকা। বল্লেন, শরীর ভাল নেই, খাবেন না। কিন্তু আমার মনে হ'ল বাবা রাগ করেছেন।

সুহাসিনী। কিসে তোর সে কথা মনে হ'ল?

লতিকা। তুমি কাল বলেছিলে মোটে তো এক সের দুধ—তার সিকি যায় চা কত্তে।

সুহাসিনী। তা সে কথা কি মিথ্যে!

লতিকা। মিছে তা বল্‌ছিনে মা। কিন্তু বাবার সেজন্য মনে দুঃখে হয়েছে—তাই বল্‌ছিলাম।

সুহাসিনী। দুঃখ হ'তে তো আর পয়সা খরচ হয় না—তা দুঃখ হবে না কেন?

লতিকা আর কিছু বলিল না। চুপ করিয়া রহিল।

মনোহর বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল উপায়ের পথ দেখিতে। কিন্তু কি উপায় যে দেখিবে তাহা সে এখনও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই। দুই একটা ছেলে পাইলে সকালের দিকে সে পড়ায়। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে ছেলে জোটানই শক্ত।

উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায়দের বাড়ীর সম্মুখে আসিবামাত্র একটি যুবক হাস্যমুখে আসিয়া পায়ের কাছে নত হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আসুন স্যার, একটু বস্‌বেন।

মনোহর যুবককে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—অমর যে! কবে এলে?

অমর বলিল—কাল রাত্রে এসেছি স্যার।

মনোহর। আর কে এসেছেন?

অমর। সবাই এসেছি। বাবা তিনমাস ছুটি নিয়েছেন, ঠিক করেছেন ছুটিতে এখানেই থাক্‌বেন। যদি সবার শরীর ভাল থাকে এখান থেকেই ছুটির পর যাতায়াত করবেন।

মনোহর। তুমি কি করবে?

অমর। আমাদের কলেজ তো এখন মাস দুই বন্ধ। যদি সুবিধা হয় এখান থেকে যাতায়াত করব—নইলে আমি একা কল্‌কাতায় যাব।

মনোহর। হোষ্টেলে থাক্‌বে?

অমর। আজ্ঞে হ্যাঁ। আসুন, বস্‌বেন একটু।

অমরের পিছনে পিছনে মনোহর ভিতরে আসিয়া বৈঠকখানায় বসিল।

মনোহর জিজ্ঞাসা করিল—তোমার বাবা এখনও ওঠেননি বোধ হয়।

অমর। আজ্ঞে না, তাঁর আজকাল উঠ্‌তে একটু দেরী হয়। আজকাল ৮টার আগে উঠ্‌তে বড় একটা পারেন না।

মনোহর। তা'হলে আর একদিন এসে ওঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যাব।

অমর। রাণু, লতু সব ভাল আছে?

মনোহর। আছে বেঁচে—আমার মত গরীব বাপের তাদের যতদূর ভাল রাখা সম্ভব ততদূরই আছে।

অমর। মাহিনে সেই ৪০৲ চল্লিশই পাচ্ছেন। আর বাড়ে নি ?

মনোহর। না, বাড়বার আশা খুবই কম।

অমর। আর কোথাও পড়ান না ?

মনোহর। পাঁচটী ছেলেকে পড়াই একসঙ্গে—২৲ টাকা করিয়া দেয়। ১০৲টি টাকা পাই—তা সে বাড়ী ভাড়াতেই যায়।

অমর। স্যার, সেকেণ্ড ক্লাসে আপনার কাছে ইংরাজি আর ফার্ষ্ট ক্লাসে History প'ড়ে গেছি। তা এখনও তেমনি মনে আছে; চিরকালই মনে থাক্‌বে; বিশেষ আপনার Poetry আর History পড়ান জীবনে ভুল্‌ব না। এখনও এক একবার মনে হয় আবার এসে আপনার ক্লাসে ব'সে আপনার পড়া শুনি। খুব কম কলেজে আপনার মত Historyর Professor আছেন। অথচ আপনি এই পাড়াগাঁয়ের স্কুলে ৪০৲ টাকায় প'ড়ে আছেন।

মনোহর। কি করব বাবা—অদৃষ্ট !

অমর। আচ্ছা স্যার ! আপনি Historyর note লিখুন না কেন ! না হয় আপনি যে রকম ক'রে পড়ান, ঠিক সেই ভাবে একখানা Historyর Text-book লিখুন। তাতে জিনিস থাকবে সাধারণ বইয়ের চেয়ে বেশী। কিন্তু ভাষা ঠিক আপনার পড়ানোর ভাষা হওয়া চাই। নিশ্চয়ই তাতে আপনার দুঃখ ঘুচবে।

মনোহর। তুমি বল্‌ছ—ভেবে দেখি। কিন্তু অমর, সংসারের চাপে একেবারে উৎসাহহীন হয়ে পড়েছি। চারদিক অন্ধকার—কোন দিক হ'তে একটা আলোর রেখা পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।

অমর। আপনি এই করুন স্যার—আপনার কাছে আলোকের প্লাবন

এসে পৌছুবে। আপনার লেখা বই নিশ্চয়ই অতি সুন্দর হবে—বাজারের কোন বই তার সঙ্গে তুলনায় পারবে না।

মনোহর। আচ্ছা অমর, আজ থেকে আমি সেই চেষ্টা করব। আজ তাহ'লে এখন উঠি।

অমর। একটু চা খেয়ে যান স্যার—এখনি নিয়ে আসছি।

মনোহর। না অমর—থাক্, আর চা খাব না।

অমর। কেন স্যার?

মনোহর। তোমার কাছে বল্‌তে লজ্জা নেই, অমর। যখন আয় বাড়াতে পারিনি, তখন ব্যয় কমানো উচিত। আজ লতু সকালে চা করছিল; আসবার সময়েও বল্‌লে বাবা চা খেয়ে যাও। বল্‌লাম—না মা, চা আর খাব না। মার মুখখানি ম্লান হয়ে গেল। তারপরে আর তো কোথাও চা খাওয়া যায় না অমর।

তারপর উঠিয়া আবার বলিল—এখন যাই তা'হলে, তুমি একদিন যেও।

অমরও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। বলিল—হ্যাঁ স্যার! নিশ্চয়ই যাব—আজই যাব'খন। বলিয়া মনোহরকে রাস্তা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিল।

সেখান হইতে বাহির হইয়া মনোহর বাজারের দিকে গেল। ততক্ষণ বেলা প্রায় ৮টা বাজিয়াছে। চারিদিকে রৌদ্র ভরিয়া উঠিয়াছে।

বাজারে তখন কাপড়, চাউল, মুদিখানা ইত্যাদির দোকান খুলিয়া গিয়াছে। কোন কোন দোকান সবেমাত্র খুলিয়া ধুনা-গঙ্গাজল দিতেছে।

নরহরি দাসের চাউল ও মুদিখানার দোকান বাজারের মধ্যে সব চেয়ে বড়। দোকানে থাকে নরহরি নিজে আর তাহার তিন ছেলে; তা ছাড়া দুজন গোমস্তা। নরহরি এতই সাবধানী আর এমনই সতর্ক তাহার ব্যবস্থা যে, সকল সময়ে অন্ততঃ দুটি ছেলে দোকানে উপস্থিত থাকিবে। ভৃত্যের হাতে এক মিনিটের জন্য দোকান ছাড়িয়া দেওয়া হয় না। হয় নরহরি নিজে না হয় দুটি ছেলে দোকানে সর্ব্বদা থাকা চাইই। তাহা ছাড়া গোমস্তা আর একটি ছেলের হাতে দোকান ছাড়িয়া না দেওয়ার উদ্দেশ্য—কাঁচা পয়সা পাইয়া পাছে একজন থাকিলে কিছু সরাইয়া ফেলে। দুজন থাকিলে যোগ করিয়া একার্য্য চালানো কিছু কঠিন হইয়া পড়ে।

নরহরি কিছু ব্যয়কুণ্ঠ, মুখমিষ্টি ও সাবধান প্রকৃতির লোক। দোকান তাহার মান, দোকান তাহার প্রাণ, দোকানই তাহার সব। লোককে আদর অভ্যর্থনা করা, সম্মান করা এসব নরহরির চিরদিনকার অভ্যাস।

মনোহরকে সকালে তাহার দোকানের সম্মুখে দেখিয়া নরহরি হাত

তুলিয়া বলিল—প্রণাম মাষ্টার মশায়, আসুন বসুন। বলিয়া বসিবার জন্য দোকানের ভিতর থলে বিছান একটা টুল দেখাইয়া দিল।

মনোহর বসিতে নরহরি আবার বলিল—সকালে বাজারে যে!

মনোহর বলিল—আপনার কাছেই একটু কাজ ছিল, তাই এসেছি।

নরহরি। আমার কাছে? কি দরকার বলুন।

মনোহর। আপনি একদিন বলেছিলেন না আপনার একজন খাতা লেখার লোক দরকার। পেয়েছেন?

নরহরি। না এখনও পাইনি—আমি নিজে চালিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু চোখে ভাল দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, একটু অসুবিধা হচ্ছে। লোক পেয়েছেন নাকি?

মনোহর। লোক ঠিক পাইনি তবে আমি আপনার খাতা লিখে দিতে রাজী আছি।

নরহরি। আপনি লিখ্‌বেন। এতে সামান্য পাওনা—আপনার মত পণ্ডিত লোককে দিয়ে এ সামান্য কাজ করান!

মনোহর। পাণ্ডিত্যের কথা আর বল্‌বেন না দাস মহাশয়। যে লোকের পরিবারবর্গের দু'বেলা দু'মুঠো ভাত ভালভাবে দিতে ক্ষমতায় কুলায় না—তাকে আর পণ্ডিত বলা সাজে না। আর আমি লিখ্‌ছি ব'লে আমাকে ন্যায্যের বেশী দিতে হবে না। আপনি অন্য লোক রাখ্‌লে যা দিতেন তাই দিবেন। তবে আমি দিনমানে লিখ্‌তে পারব না। সন্ধ্যার পর এসে যতক্ষণ বলেন লিখে দেব। তাতে আপনার আপত্তি নেই তো?

নরহরি। না, তাতে আর আপত্তি কি হ'তে পারে। বেশ, আপনি তাই লিখ্‌বেন। তা কত কি দিতে হবে একটা ঠিক ক'রে ফেলুন।

মনোহর। সে আপনার যা ইচ্ছে তাই দেবেন।

নরহরি। সে তো ঠিক হ'ল না—একটা পাকা কথা কওয়া দরকার।

মনোহর। আমি তো জানিনে—এতে কি রকম আপনারা দেন। আমি চাই সৎপথে থেকে আরও কিছু উপায় করতে—কারণ আমি মাষ্টারিতে যা উপায় করি তাতে আমার ভাল চলে না। আমি আপনার খাতা লিখে দেব; আরও দু'এক দোকানে যদি খাতালেখা আপনার দয়ায় পাই—তাহ'লে আমার এক রকম চ'লে যাবে।

নরহরি হিসাব করিয়া দেখিল মাসে ৫৲ টাকার কমে আজকাল কোন লোকই লিখিতে রাজী হয় না। এ রকম ইংরাজি-জানা লোক একজন যদি হাতে থাকে অনেক উপকারে আসিতে পারে। তাহার উপর মনোহর বাবু লোক খুব ভাল জানা আছে। তবে খুব হিসাবী ব্যবসাদার হইলেও একজন পণ্ডিত লোককে মাসে ৫৲ দিব বলিতে তাহার মুখে বাধিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে বলিল—আপনি সংবৎসরের খাতা ঠিক ক'রে দিবেন, আমি ৭৫৲ টাকা আপনার খোকাকে জল খেতে দিব। অবশ্য ২।৪ খানা ইংরাজিতে চিঠি পত্র লিখতে হয় তাও আপনাকে দয়া ক'রে লিখে দিতে হবে। তবে এ টাকা আপনার যখন ইচ্ছে নিতে পারেন, তিন কিস্তিতেও নিতে পারেন।

মনোহর। আমি তো আপনাকে বলেছি আপনি যা বলবেন তাতেই আমি রাজী হ'ব। আপনি ৫০৲ টাকা বললেও আমি রাজী হ'তাম। আমি এতেই রাজী এবং চিঠিপত্র বাংলা হউক ইংরাজি হউক আপনার যা দরকার হবে আমি তাই লিখে দেব। আপনি দয়া ক'রেএকটু প্রবন্ধ করবেন যাতে আরও ২।১ দোকানে খাতা লেখা পাই।

নরহরি। আচ্ছা আমি সে চেষ্টা করব। নবীন আমার জ্যেঠতুত

ভাই হয়। তার দোকানে বোধ হয় খাতালেখার লোকের দরকার। কিন্তু আমার এই যে আশ্চর্য্য মনে হয়, মাষ্টার মহাশয়, আপনারা এত লেখাপড়া শিখেও আপনাদের এ অর্থকষ্ট হয় কেন! আমরা মুখ্যু মানুষ—ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে যদি দু'পয়সা ঘরে আন্‌তে পারি, আপনার লেখাপড়া শিখে তার চেয়েত বেশী পারা উচিত।

মনোহর। আপনার উক্তির মূল কথাটা ঠিক। বুদ্ধি থাকলে ও বেশী লেখাপড়া শিখলে উপার্জ্জনের শক্তি বেশী হওয়া উচিত। তাতে সন্দেহ নাই; হয়ও তাই। আপনি মূর্খ এবং আমি বিদ্বান্ এ ভুল কথা। কারণ ব্যবসার যে বিদ্যা সে আপনিই আয়ত্ত করেছেন, আর আমি তাতে একেবারে অজ্ঞ। সাধারণ সংসারের অভিজ্ঞতা যার দাম পড়া বিদ্যার চেয়ে অনেক বেশী—তাতে আমি আপনার কাছে দাঁড়াতেও পারিনে। ব্যবসার যে হিসাবপত্র যা আমি কাগজে কলমে কর্‌ব আপনি তা মুখে মুখে করে ফেলবেন। তবে আমি ইংরাজিতে কিছু কিছু লিখ্‌তে বা কথা বল্‌তে পারি আপনি তা পারেন না।

নরহরি। আপনি নিজেকে ছোট ক'রে আর আমাকে বাড়িয়ে অনেক কথা বল্‌লেন। কিন্তু আপনিও কি ইচ্ছে করলে ব্যবসা কর্‌তে পারেন না? আর ব্যবসা কল্লে কি আপনারই ব্যবসাতে বুদ্ধি খেলে না? নিশ্চয়ই খেলে।

মনোহর। তা খেল্‌তে পারে, তবে অনেক পরে। সব কাজেই শিক্ষা দরকার। ব্যবসার মত বড় জিনিষ শিক্ষা না হ'লে হবে কি ক'রে! আমি যদি ব্যবসার হাতে কলমে শিক্ষা না পেয়ে ব্যবসা করি আমাকে লোকসান খেতে হবে। লোকসান খেয়ে খেয়ে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা হ'লে

তবে যদি সমান হ'তে পারি। তারপর টাকার দরকার। টাকা না হ'লে কিছুই নয়।

নরহরি। টাকার দরকার বটে মাষ্টার মশায়। কিন্তু ইচ্ছা আর চেষ্টা থাকলে টাকা করতে বেশী দিন লাগে না। আমি আমার মামার কাছে একটা টাকা নিয়ে ব্যবসা স্বরু করেছিলেম। সেই টাকাতে চিনি, মিছরি, দু'চার রকমের মশলা এই নিয়ে এখান থেকে দু'তিন ক্রোশ দূরের পাড়াগাঁয়ে যেতাম। দাঁড়ি পাল্লা ছিল না, মশলার একপয়সার ক'রে পূরিয়া রাত্রিযোগে বেঁধে রাখতাম। মনে আছে দু' আনার মরিচ কিনেছিলেম; সেই মরিচ ষোল পূরিয়া করেছিলেম; এক এক পূরিয়া এক পয়সা। চিনির জন্য একটা ছোট বাটি রেখেছিলাম—এক পাত্র এক পয়সা। সেও রাতে পূরিয়া ক'রে রাখতেম। পাড়াগাঁয়ে দুয়ারের সামনে পেয়ে সবাই প্রায় ২।১ পয়সা ক'রে জিনিস কিনলে! প্রথম দিনেই আমার ১৲ টাকার জিনিষ ২৲ টাকায় বিক্রি হ'ল। সে সব গ্রামে তরীতরকারি সস্তা বিক্রী হত; আলু পটল নয় অবিশ্যি। লাউ কুমড়া এই সব। আনা আষ্টেকের তাই কিনে আনতাম। এ গ্রামে তাই অন্ততঃ দেড়া দামে বিক্রয় করতাম। এই রকম খাওয়া খরচ বাদে মাস কয়েকের মধ্যে আমার হাতে ১০০৲ একশত টাকা হ'ল। তখন পাড়াতে ছোট একখানা মুদিখানার দোকান দিই; আর বাড়ীতে যেটুকু জমী ছিল তাতে লাউ কুমড়া বেগুন এই সব লাগাতাম। দোকানে তাও রাখতাম, বাজারের চেয়ে সস্তার না হ'লেও অন্ততঃ সমান দরে দিতাম। পাড়ার মেয়েরা যাঁদের বাড়ীতে পুরুষ নেই তাঁরা আমার দোকান থেকে নিতেন। তারপর দোকানের মাল ছাড়া হাতে যখন শ পাঁচেক টাকা জমে, তখন ওই মতি কুণ্ডুর দোকানের কাছাকাছি মুদিখানার দোকান দিই। তারপর

কিছু কিছু চালও সঙ্গে রাখি। তারপর ক্রমে ক্রমে আপনাদের আশীর্বাদে যা কিছু হয়েছে।

মনোহর। এত কষ্ট করেছেন তাই না ব্যবসায়ে সফল হয়েছেন। এত কষ্ট করার ক্ষমতা বা সাহস কি আমাদের আছে? আপনি মাথায় জিনিস নিয়ে ফিরি ক'রে বিক্রি করেছেন আর তা করতে আপনার লজ্জা হয়নি—আর এখন লক্ষপতি হয়ে তা বলতেও আপনার লজ্জা নেই। আর আমরা চেয়ারে ব'সে কাজ করি বলে জীবন ধন্য মনে করি। সমস্ত মাস খেটে ৩০৲।৪০৲ টাকা আনতে লজ্জা পাইনে। সেই ৩০৲।৪০৲ টাকা থেকে গড়ে অন্তত টাকা পাঁচেক জামা কাপড়ে চ'লে যায়। আমার যা অবস্থা আমার নিজ হাতে বাজারে এসে বাড়ীর তরকারি বিক্রি করা উচিত। তা তরকারি বিক্রি করবো কি—একটা লাউ কুমড়া গাছও বাড়ীতে যে পুঁতে নিজেদের বাজার খরচ কমাব তাও হয় না আমাদের দ্বারা। তবে আপনার কথার গুণে আজ আমার অনেক শিক্ষা হ'ল দাশমশায়। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

দেখি আপনার আদর্শ নিয়ে এই অবেলায় কিছু করতে পারি কিনা। এখন তা হ'লে উঠি। আমি আজ সন্ধ্যা থেকেই আসব। প্রথম দিন আপনি আমাকে শুধু এইটুকু বুঝিয়ে দেবেন কি করে আপনারা হিসাব পত্র রাখেন। কিংবা আপনার আগেকার খাতা পত্র দেখালেও আমি ঠিক ক'রে নেব।

নরহরি। সেজন্য আপনি ভাববেন না, আমি আপনাকে তা নিজে বুঝিয়ে দেব। তা ছাড়া আমার লেখা খাতা পত্রও আছে তাও দেখবেন।

আমিও তো আগে খাতা পত্র লিখ্‌তাম। ইদানীং চোখে একটু কম দেখছি ব'লে ছেড়ে দিইছি।

মনোহর তখন উঠিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে ফিরিল, অবস্থা পরিবর্ত্তন করিবার অনেক উপায়ের কল্পনা তাহার মনোমধ্যে ধীরে ধীরে উদিত হইতে লাগিল।

[৫]

অমরের পিতা চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ডিরেক্টার জেনারেল of Post officeএর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। মোটা মাহিনা পান। পূর্ব্বে গ্রাম হইতেই ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতেন, সাহেবি পদ হইলেও মেজাজ আদৌ সাহেবি নয়। ধুতি কামিজ উড়ানি পরিয়া বাড়ী হইতে বাহির হন। চাপরাশী ব্যাগ লইয়া যায়। সেই ব্যাগে আফিসের পোষাক থাকে। আফিসের নিজের কামরায় গিয়া পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া কাজ করিতে সুরু করেন। আবার কাজ শেষ হইলে ধুতি কামিজ পরিয়া আফিস হইতে বাহির হন। চাপরাশী ব্যাগে পোষাক ভরিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফিরে। গ্রামের লোকে ও কলিকাতার বাসার আশে পাশের লোকেরা চিরদিনই তাঁহাকে ধুতি কামিজ ও উড়ানি পরা অবস্থাতেই দেখিতে অভ্যস্ত। তিনি যে আফিসে নিখুঁত সাহেবি পোষাক পরিয়া আফিস করেন, ২ জন চাপরাশী যে তাঁহার কামরার বাহিরে উৎকর্ণ হইয়া সর্ব্বক্ষণ

বসিয়া থাকে যে, কখন ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে—কেরাণীদের কোন কাজের জন্য কাছে ডাকিলে তাহারা তটস্থ হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শীতের দিনেও ঘামিতে থাকে, ইহা চন্দ্রনাথ বাবুর আফিসের মধ্যে না থাকিলে কাহারও বুঝিবার সাধ্য হইত না।

বাড়ীতে তিনি সাত্বিক প্রকৃতির ব্রাহ্মণ, অতি উচ্চ বংশ। নৈকষ্য কুলীন। বংশমর্য্যাদা একটু রাখিয়া চলেন। তিনটি মেয়ের বিবাহ ঠিক পাল্‌টা ঘরে দিয়াছেন। ছেলেও তিনটি। অমরই বড় ছেলে—বৎসর কুড়ি বয়স। প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ পড়িতেছিল—এইবার বি-এ পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে। অমরেব বড় একটি বোন্। তারপর এক ভাই সমর, সে এখনও স্কুলে পড়ে। বয়স দশ বৎসর।

অমর খুব মেধাবী ছাত্র, মেট্রিকুলেশনে বৃত্তি লইয়া পাশ করে। আই-এতেও বৃত্তি পায়। কলিকাতায় পড়িবার সময় হইতে চন্দ্রনাথ বাবু সপরিবারে কলিকাতায় বাসা করিলেন। কয়েক বৎসর কলিকাতায় থাকিবার পর আবার তাঁহাদের কিছুদিন দেশে থাকিবার সাধ হওয়ায় ছিল লইয়া দেশে ফিরিয়াছেন।

মনোহরকে আগাইয়া দিয়া অমর বাড়ীর ভিতর গিয়া দেখিল তাহার পিতা উঠিয়াছেন। হাত মুখ ধোয়াও হইয়া গিয়াছে। তিনি আহ্নিকে বসিয়াছেন। উনানে চায়ের জল চড়িয়াছে।

পিতার আহ্নিক শেষ হইলে অমর বলিল—বাবা, আজ আপনি এরই মধ্যে উঠে হাত মুখ ধুয়েছেন—আমি তা জান্‌তেই পারিনি। মাষ্টার মহাশয় মনোহর বাবু এসেছিলেন, আপনার কথা জিজ্ঞাসা করলেন; আমি বল্লাম বাবার শরীর খারাপ ব'লে আজকাল উঠ্‌তে একটু দেরী

হয়। তিনি ব'লে গেলেন, আর একদিন এসে আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন।

চন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন—তুমি আমাকে কেন ডাক্‌লে না বাবা? আমি খুব সকালে উঠিনে, কিন্তু বিছানায় তো জেগে থাকি। তাকে চা খাইয়েছ তো?

অমর। তিনি চা খেতে চাইলেন না? বল্লেম চা আর খাবেন না।

চন্দ্রনাথ। কেন—তিনি এত চা খেতেন, হঠাৎ ছেড়ে দিলেন যে?

অমর। আয় তো বাড়াতে পাচ্ছেন না—খরচ যদি একটু কম করতে পারেন তারই জন্য। বল্লেন, লতিকা চায়ের জল চড়িয়েছিল, তিনি ব'লে বেরিয়েছেন চা খাবেন না; যদি তাহাদের ইচ্ছা হয় তারা খেতে পারে। তাঁর কথার ভাবে বোধ হ'ল খুব অর্থকষ্টে পড়েছেন, আর মনেও খুব আঘাত পেয়েছেন। মাইনে পান মাত্র ৪০৲ টাকা—আর এত ভাল টিচার। ও রকম History পড়াতে কলেজেও দেখিনি।

চন্দ্রনাথ। বড়ই দুঃখের বিষয়। আমরা এ সময়ে তাঁর কি উপকারে আস্‌তে পারি ভেবে দেখ।

অমর। সমর তো এখানেই এখন পড়্‌বে—আমি যেমন তাঁর কাছে পড়্‌তাম সমরও যদি তাঁর কাছে পড়ে তাহ'লে ভাল হয়।

চন্দ্রনাথ। ঠিক বলেছ—তাই পড়ুক সমর। কত ক'রে দেওয়া যাবে?

অমর। সে আপনি বলুন। আমি আজ বিকালে তাঁর কাছে যাব, গিয়ে তাঁকে ব'লে আস্‌ব।

চন্দ্রনাথ। তুমি কত ক'রে দিতে ?

অমর। ১৫৲ টাকা।

চন্দ্রনাথ। এবার ২০৲ টাকা ক'রে দিও।

অমর। সেই ভাল হবে বাবা। আমি আজ গিয়ে তাঁকে ব'লে আস্‌ব যাতে কাল থেকেই পড়াতে আসেন।

বেলা ৫টা আন্দাজ অমর মনোহরদের বাড়ী গেল। মনোহর ও রাম-প্রসাদ তখনও ফেরে নাই। মেয়েরা সবাই আছে।

অমর তিন বৎসর মনোহরের কাছে পড়িয়াছে। মনোহর পড়াইতে যাইত। কখন কখন মনোহরের শরীর খারাপ থাকিলে নিজে ইচ্ছা করিয়া বাড়ী আসিয়া পড়িয়া যাইত। সেই সূত্রে সকলের সঙ্গেই তাহার বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। সেই হইতে সুহাসিনীকে সে কাকীমা বলে, লতিকারা অমর-দা বলিয়া ডাকে। কলিকাতায় গিয়াও প্রথমে বৎসর ২।১ বার বাড়ী আসিলে অমর দেখা করিয়া আসিত। ইদানীং বৎসর দুয়েক একেবারে আসে নাই।

অমর আসিয়া বাহির হইতে ডাকিল—রামু!

তখন মেয়েরা ও সুহাসিনী রান্নাঘরে, কেউ শুনতে পাইল না। অমর ভিতরে আসিয়া ডাকিল—কাকীমা! লতিকা বাহিরে আসিয়াই অমরকে দেখিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে তাহাকে লতিকা প্রায় বালকের মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিল। প্রথম কলিকাতা গিয়া মাঝে মাঝে অমর যখন আসিত তখনও তাহার মধ্যে যে কোন পরিবর্ত্তন আসিয়াছে তাহা মনেও হয় নাই। আজ দুই বৎসর পরে লতিকা অমরকে একেবারে নূতন মূর্ত্তিতে দেখিল। তাহার বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহের উপর যৌবন এক মধুরিমা বুলাইয়া দিয়া

গিয়াছে। তাহার দেহের শ্যামবর্ণ যেন শ্রীকৃষ্ণের নবঘন শ্যামে পরিণত হইয়াছে। দীর্ঘ বাহু ও সুকৃষ্ণ আয়ত চক্ষু—সেই শ্যাম মূর্ত্তিকে বড়ই মনোহর করিয়া তুলিয়াছে।

আরও দুই বৎসর পূর্ব্বে অমর লতিকাকে দেখিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজ যাহাকে দেখিল সে লতিকার শান্ত মূর্ত্তি—গৌরী শ্রী আর কোনদিন তাহার চক্ষে পড়ে নাই। এই সুমধুর প্রথম যৌবনের অপরূপ লাবণ্য সর্ব্বদেহে ভরিয়া, চক্ষে এক অপরূপ শ্যামাঞ্জন মাখিয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে লতিকা আজ যেন প্রথম তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। দু'জনেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে দু'জনকে দেখিল। এ দুর্লভ দৃষ্টি দিয়া নর ও নারী পরস্পরকে একবার মাত্র দেখিতে পায়, পরে সহস্র গুণে সুন্দর সুন্দরীকে দেখিলেও সে দৃষ্টি আর মিলে না। কিন্তু এক মুহূর্ত্ত মাত্র। পরক্ষণে লতিকা বলিল—একি অমর-দা যে! এস! কবে এলে? অমরেরও চমক এতক্ষণে ভাঙ্গিল, বলিল, এখানে কাল এসেছি, তোমরা—সব ভাল আছ ত?

অমর উঠিয়া আসিল।

রান্নাঘরের ভিতর হইতে সুহাসিনী বলিল, কিরে লতু!

লতিকা বলিল, অমর-দা এসেছেন মা।

সুহাসিনী বাহিরে আসিলেন, অমর প্রণাম করিল।

সুহাসিনী কুশল প্রশ্নাদি করিয়া বলিল—আজকাল তো তুমি আর আস না বাবা—আগে কত আস্‌তে।

অমর বলিল, আমরা তো বছর দুই একেবারে বাড়ী আসতে পারিনি। নইলে এলে আমি আপনাদের কাছে না এসে যাইনে। এবার মোটে কাল সন্ধ্যায় এসেছি। সকালবেলা স্যারের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল তাই তখন আর আসিনি। স্যার এখনও ফেরেন নি কাকী মা?

সুহাসিনী। ছটায় আন্দাজ ফেরেন।

অমর। কেন এত দেরি হয় যে! এখান থেকে কি কাউকে পড়াতে যান নাকি?

সুহাসিনী। ইস্কুলে বুঝি পাঁচটা ছেলে পড়ে। ১০টা টাকার জন্য তাদের সবাইকে দুটি ঘণ্টা পড়াইতে হয়। খুব বেশী দেরী নাই আর। তুমি এদের সঙ্গে একটু গল্প গুজব কর। লতু যা ত মা ওই ওঁর ঘরে অমরকে বসতে দিয়ে আয়।

লতিকা তাহার পিতার ঘরের দুয়ার খুলিয়া অমরকে বসিতে দিল। এই ঘরটাই বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে ছোট ঘর। দিনমানে লোকজন আসিলে বসিতে দেওয়া হয়।

ঘরটির সহিত অমর বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। ঘরটি তার শিক্ষকের প্রিয় পুস্তকে পূর্ণ। এবার আসিয়াও দেখিল দুটি সেল্‌ফ বাড়িয়াছে —একটিতে লতিকার বই, অপরটিতে যূথিকা ও রামপ্রসাদের বই থাকে।

কি কথা কহিবে তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া অমর একটা সেল্‌ফের কাছে গিয়া বই নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। বইগুলি দেখিয়া অমর বলিল, লতু, তুমিতো অনেক বই প'ড়ে ফেলেছ এর মধ্যে। তোমার বাংলা আর ইংরাজী বইয়ের selection (নির্ব্বাচন) বড় সুন্দর হয়েছে। এগুলি সব পড়া হয়েছে তোমার ?

লতিকা। সলজ্জভাবে বলিল, হ্যাঁ!

অমর। এখন তাহ'লে কি পড়্‌ছ ?

লতিকা। ও গুলি revise করছি। বাবা বলেছেন—প্রত্যেক বইখানি

পড়্‌তে হবে, আর সেই বইখানির মোট কথা (substance) সংক্ষেপে লিখ্‌তে হবে।

অমর। কতগুলো ও রকম লেখা হয়েছে ?

লতিকা। বাংলা সব হয়েছে, ইংরাজী অর্দ্ধেক।

অমর। History পড়েছ ?

লতিকা। হ্যাঁ, শুধু ভারতবর্ষের পড়েছি। আর ইংলণ্ডের ইতিহাস ও জিওগ্রাফি (Geography) বাবা মুখে মুখে শেখান আর নোট করিয়ে দেন।

অমর। তবে তো তুমি সব বিষয়ে ম্যাট্রিকুলেশন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ছাড়িয়ে গিয়েছ। Mathematics কি পড়েছ ?

লতিকা। শুধু পাটীগণিত ভাল ক'রে শিখেছি। Algebra ও Geometry'ও কিছু জানি। বাংলা আর ইংরাজী বাবা ভাল ক'রে শিখ্‌তে বলেন, স্কুল থেকে সে জন্য ছোট ছোট বই এনে দেন। সে সব বই শীঘ্র শেষ ক'রে আবার ফেরৎ দিতে হয়।

অমর। দেখি তোমার নোট। কি রকম নোট রেখেছ দেখি।

লতিকা দুখানি মোটা বাঁধান খাতা অমরের সম্মুখে রাখিয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে গেল।

মিনিট দশেক পরে সে একহাতে চায়ের পেয়ালা অপর হাতে চারখানা ছোট লুচি ও খানকয়েক আলুভাজা লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল।

সে গুলি টেবিলের উপর রাখিয়া লতিকা বলিল—মা বল্‌লেন খাও।

অমর লতিকার নোট হইতে মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল—তুমি বুঝি বল্‌বে না।

লতিকা হাসিয়া মাথা নীচু করিল।

অমর বলিল, সুন্দর নোট করেছ তুমি! খাসা হয়েছে। তোমার যে পড়া খুব ভাল হয়েছে তা তোমার নোট দেখেই বোঝা যায়। স্যার তোমাকে বেশ ভাল ক'রে লেখা পড়া শেখাচ্ছেন। লেখায় তুমি শীগ্‌গির আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে।

ললিকা বলিল—তুমি ঠাট্টা কর্‌ছ অমর-দা। আমার মত বয়সে কত মেয়ে আই-এ পড়ছে।

অমর। তা পড়ুক, তাদের চেয়ে তোমার সত্যিকারের জানা ঢের বেশী হয়েছে।

লতিকা লজ্জায় আর কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু এক একবার আনন্দে তাহার সারা চিত্ত ভরিয়া গেল।

অমর খাবার খাইয়া চায়ে চুমুক দিয়া বলিল, সুন্দর চা হয়েছে, তুমি করেছ?

লতিকা ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—হ্যাঁ।

তারপর ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, আমার মত বয়সে সংসারের সকল কাজ করা উচিত—চা, ত কিছুই নয়।

অমরও হাসিয়া বলিল—তোমার মতে তাহ'লে তোমার মত বয়সে একেবারে সব জান্তা ও সব পার্‌তা হওয়া উচিত।

লতিকা হাসিয়া ফেলিল।

অমর জিজ্ঞাসা করিল, হাস্‌লে যে?

লতিকা বলিল, তোমার মুখে নূতন কথা শুনে।

অমর। কি নূতন কথা ?

লতিকা। এই—সব পার্‌তা।

অমর। ও! ওটি সব জান্‌তার মাসতুতো ভাই। সব জান্‌তা যদি হয় সব পার্‌তা কেন হবে না ?

লতিকা। তাতো বটেই।

কথা কহিতে কহিতে চা পান শেষ হইয়া গেল। লতিকা খাবারের শূন্য পাত্র ও চায়ের খালি পেয়ালা লইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

অমর তখন লতিকার ইংরাজী বইয়ের নোট লইয়া পড়িতে লাগিল। অমর দেখিল পাঠ্য পুস্তক ছাড়াও ভাল ভাল অনেকগুলি ইংরাজী বই লতিকা পড়িয়াছে আর বেশ সরল ও মিষ্টি ভাষায় তাহার নোট রাখিয়াছে। অমর দেখিল অঙ্কশাস্ত্র বাদ দিলে লতিকা বেশ ভাল ভাবে I.A. Standardএ পড়িতেছে। ঘরে পড়িয়া গৃহকর্ম্মের মধ্যে থাকিয়া স্বল্প অবসরের মধ্যে যাহা সে পড়িয়াছে তাহা অতিশয় প্রশংসার যোগ্য।

অমর যখন নিবিষ্টচিত্তে লতিকার নোটগুলি পড়িতেছিল লতিকা তাহার মধ্যে বার দুই আসিয়া অমরকে তাহারি নোট একমনে পড়িতে দেখিয়া লজ্জায় ও একপ্রকার আনন্দে ফিরিয়া গিয়াছিল ও খুব চটপট্‌ করিয়া মায়ের কার্য্যে সহায়তা করিতেছিল।

সুহাসিনী একবার বলিল—তুমি অমরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওগে, যূথি রুটি কখানা বেলে দিচ্ছে।

লতিকা বলিল, অমর-দা বই পড়ছেন, আমি চট্‌ ক'রে বেলে দিয়ে

যাচ্ছি। যূথি ততক্ষণ খোকাকে নিয়ে একটু বেড়াক। যূথিকা রান্নাঘর হইতে ছাড়া পাইয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া অমরের ঘরের দিকে আসিল। তারপর দুপ্‌দাপ্‌ করিতে করিতে আবার রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ও দিদি ভাই, অমর-দা তোমার লেখা নোট্‌ পড়্‌ছেন।

লজ্জায় লতিকার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। মাথা নীচু করিয়াই সে রুটি বেলিতে লাগিল। মনে মনে যূথিকার উপর রাগ করিয়া ভাবিল ভারি নূতন খবর নিয়ে এলেন! একথাটা আর মায়ের কাছে এসে না বল্লে হ'ত না? মেয়ে যেন কি!

মেয়ে ততক্ষণ অমূল্য সংবাদ দিয়াই রান্নাঘর ত্যাগ করিয়াছে। সুহাসিনী একবার অপাঙ্গে কন্যার লজ্জানত মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন। মনের মধ্যে একটা কথার উদয় হইল। জোরে একটা নিশ্বাস পড়িল। নিশ্বাসের শব্দে লতিকা মুখ তুলিয়া চাহিল। দেখিল মা উনানের দিকে মুখ করিয়া একমনে রুটি সেঁকিতেছেন।

রামপ্রসাদ বাহির হইতে ডাকিল—মা! সুহাসিনী বলিল—আয়! একবারে হাত মুখ ধুয়ে আয়, খাবার হয়েছে।

মনোহর আপনার ঘরে ঢুকিয়া অমরকে দেখিয়াই বলিলেন—এই যে অমর, কতক্ষণ এসেছ?

অমর বলিল, ঘণ্টাখানেক হ'ল এসেছি। আপনি স্কুলের এই খাটুনির পর সঙ্গে সঙ্গে টিউশনি করেন কেন আর?

মনোহর। কি করি অমর। নইলে যে কুলুতে পারিনে। এই সময়ে তবু ৫টা ছেলেকে একসঙ্গে পাওয়া যায়, যা দেয় তাই লাভ। তবু তো কিছু কাজে লাগে।

অমর। আপনি স্যার হাতমুখ ধুয়ে আসুন। আমি ব'সে আছি।

মনোহর হাত মুখ ধুইতে গেল। যূথিকা খবর দিয়া গেল, খাবার দেওয়া হয়েছে। যখন রান্নাঘরের কাছাকাছি মনোহর পৌছিয়াছে, রামপ্রসাদ ভিতর হইতে বলিল, মা, আর রুটি নেই ?

সুহাসিনী উত্তর দিল আর তো বেশী নেই বাবা—সবারি জন্য দু-দু'খানা আছে, তা তুই আর একখানা নে।

রামপ্রসাদ বলিল, না মা, আর খাব না। দিদিদেরও ত খিদে লাগবে। বরং সকালে সকালে ভাত দিও'খন। আর আজ আমি স্কুলে দু'পয়সার খাবার খেয়েছি। আমি বল্লাম খিদে লাগেনি, বাবা তবু শুন্‌লেন না।

এতদিন পরে আজ খাবার দেওয়ার কারণ সুহাসিনী বুঝিল, কিছু বলিল না।

এমন সময়ে মনোহর ঘরের মধ্যে আসিলেন। তাহার পাতেও দুখানা রুটি ও একটু তরকারি ছিল। রামপ্রসাদ উঠিয়া যাইতেছিল, মনোহর তাহাকে বসিতে বলিয়া পাত হইতে একখানা রুটি ও একটু তরকারি তুলিয়া দিল।

রামপ্রসাদ ব্যস্ত হইয়া বলিল—বাবা, আমি যে এইমাত্র খেয়ে উঠ্‌ছি। আমাকে আবার কেন দিলেন ?

মনোহর গম্ভীর মুখে বলিল—তুই খাতো বাবা, বেশী বকিস্‌নে। ছেলেমানুষের বেশী বকা ভাল নয়।

রামপ্রসাদ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া খাইতে লাগিল—সে খুব ধীরে ধীরে

খাইতে লাগিল—পাছে ওখানা উঠিয়া গেলে পিতা আবার ওখানি হইতেও কিছু তুলিয়া দেন।

মনোহর আধখানা রুটিতে তরকারিটুকু লইয়া খাইয়া ফেলিল ও পরে জলপান করিয়া উঠিল। পাতে আধখানা পড়িয়া রহিল।

সুহাসিনীর সন্দেহ হইল তাহাদের মাতাপুত্রের কথা বোধ হয় মনোহর শুনিয়াছে! তাহার মনে একটা আঘাত লাগিল, বলিল, ও আধখানা বা থাকে কেন, কাউকে দিয়ে দিলে হ'ত।

মনে তখন তাহার ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত স্বামীর জন্য সমবেদনা জাগিতেছিল, কিন্তু মুখ হইতে যাহা বাহির হইল তাহাতে সমবেদনার চিহ্ন কিছুই ছিল না।

স্বামী উত্তরে কিছু না বলিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিয়া উঠিয়া পড়িল ও ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

সুহাসিনীর চোখে জল আসিল। সবারি অলক্ষ্যে সে তাহা নীরবে মুছিয়া ফেলিল।

[৬]

পর মাসে সুহাসিনী সংসার খরচের যে টাকা পাইত তাহা হইতে ১০৲ দশ টাকা বেশী পাইল। তাহাতে সংসারের স্বচ্ছলতা একটু হইল বটে, কিন্তু অশান্তি হইল তার চেয়ে বেশী। সুহাসিনী হিসাব করিয়া দেখিল স্বামী পূর্ব্বের চেয়ে সকালে ঘণ্টা দুয়েক ও রাত্রেও ঘণ্টা দুয়েক

কখনও বা বেশী বাহিরে থাকেন অথচ টাকা যাহা বেশী দেন তাহা মাত্র দশটি। মাসিক এই ১০৲ দশটি টাকার জন্য কি তাঁহাকে প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা করিয়া খাটিতে হয়? যদি তাই হয়, এত খাটুনির দরকার? সত্য বটে টাকা কিছু বেশী হইলে সাংসারিক স্বচ্ছলতা এবং সঙ্গে সঙ্গে শান্তি কিছু বাড়িবে। কিন্তু শরীর যেখানে চলিবে না—সেখানে সে চেষ্টার কি প্রয়োজন? ইহার উপর বাড়ী আসিয়া মেয়েদের পড়ান আছে। তারপর রাত্রি জাগিয়া অমরের কথামত কি একখানা বই আরম্ভ করিয়াছেন। কি হইবে এইসব লিখিয়া? যৌবনাবধিই তো লেখাপড়া লইয়াই রহিলেন কিন্তু কি সুফল হইল তাতে?

একদিন কথাটা স্বামীকে বলিবে বলিবে করিয়া সুহাসিনীর মাস তিন চার কাটিয়া গেল। একদিন রাত্রি দশটার পর শ্রান্তদেহে ও শুষ্ক মুখে স্বামী গৃহে ফিরিতে সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করিল এত রাত্রি পর্য্যন্ত কোথা ছিলে?

মনোহরের মুখে একটু কঠিনতা ফুটিয়া উঠিল; কহিলেন, কি করব বল—অন্নচিন্তা। সংসার তো চালাতে হবে।

সুহাসিনীর মনে স্বামীর শুষ্ক মুখের জন্য করুণাই জাগিতেছিল, কিন্তু শুষ্ক কথার শুষ্ক উত্তরই আসিয়া পড়িল—এমন সংসার না করিলেই ত হয়। এই যে সকাল সন্ধ্যা বাড়্‌তি খাটছ, তার জন্য কত দিচ্ছে শুনি। দশ টাকার জন্য এত ভূতের মত খাটুনি কেন?

উত্তর হইল ভূত যে সে ভূতের মতই খাটিবে, দেবতার মত খাটবার ক্ষমতা সে কোথায় পাবে? দেবতা অল্প খেটে বেশী টাকা উপায় করে, কিন্তু ভূত তো তা পারে না; তাকে বেশী খেটে কম টাকা উপায় করতে হয়। এই তার ভাগ্য।

সুহাসিনী একটু ঝাঁঝের সহিত বলিল—টাকার কথা আমায় কেন বল, আমি কি তোমার টাকার প্রত্যাশী? বেশী উপায় কর তোমার ছেলে মেয়ে সুখে থাক্‌বে—কম উপায় কর তারা কষ্ট পাবে; আমার কি? আমার ভাল খাওয়ার ভাল পরার জন্য কখনো তোমাকে বলিনি, আজও বল্‌বার ইচ্ছা রাখিনে। তখন আর আমাকে টাকার খোঁটা দাও কোন্ মুখে!

মনোহর শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন—আমি তো টাকার খোঁটা দিইনি। তুমিই তো টাকার কথা তুল্‌লে।

বলিয়া আর কথা বাড়াইবার ইচ্ছা না করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সুহাসিনী খানিকক্ষণ কক্ষমধ্যে 'কাঠ' হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর মনে মনে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

বাহিরে ঘোর অন্ধকার। আকাশে অগণিত নক্ষত্র, কিন্তু তাহাদের আলোক ধরণীতে নামিবার বহুপূর্ব্বে শূন্যপথে মিলাইয়া যাইতেছে। এক পাশের কক্ষে বসিয়া লতিকা তখনও নিবিষ্টমনে পড়িয়া যাইতেছে। রামপ্রসাদ জাগিয়া থাকিয়া পড়িবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও দিদির পাশে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আপনাদের পড়িবার ইচ্ছা অপেক্ষা পিতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যে এই ছেলেমেয়ে দুটির পড়িবার বেশী ইচ্ছা সে কথা মনোহরের অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু কই সন্তোষের আলোক যে এখনও বহু ঊর্দ্ধে! দরিদ্রের দুঃখ ও হতাশার দীর্ঘশ্বাসের এখনও তো কোন প্রতিকার হ'ল না?

আরো খাটিবেন, কিন্তু সময় কই? আর সময় থাকিলেও সে

সময়টুকু মূল্য দিয়া ক্রয় করিবে কে? এ সমস্ত দুঃখের মূলে অভাব দূর হইলেই দুঃখ আর থাকিবে না। স্নেহ প্রেম কিছুই তো সংসারে কম ছিল না। কিন্তু অভাব আসিয়া যে ধীরে ধীরে সমস্ত গ্রাস করিয়া ফেলিল। এ অভাব কি ভাগ্যের মত শাশ্বত ও অমোঘ হইয়া রহিয়া যাইবে, না মেঘের মত একদিন কাটিয়া যাইবে! তাঁহার জীবদ্দশায় না হউক মরণের পরও যদি এ অভাব দূর হয় তাহা হইলেও তাঁহার ক্ষোভ নাই। কিন্তু তাহাই কি যাইবে? যাউক্ না যাউক্ এ চেষ্টার ত্রুটি তিনি করিবেন না। জীবনের শেষ ক্ষণ পর্য্যন্ত এ চেষ্টা তিনি ছাড়িবেন না। দুঃখের জন্য দুঃখ করিবেন না। দুঃখ তো জীবন ভোর। জীবন! সে তো আর নূতন কিছু নয়, মরণের দুয়ারে পৌঁছিবার সময়টুকু মাত্র। একটা দিন কাটানো মানে মরণের দিকে একটি দিন আগাইয়া যাওয়া মাত্র। তখন আর ভয় কিসের?

হঠাৎ সুহাসিনীর ডাকে চমক ভাঙ্গিল—রাত ১২টা বাজে সে হুঁস আছে। এখন দুটো খাও, খেয়ে আমাকে ছুটি দাও। আমারও তো মানুষের শরীর, লোহার নয় যে ২৪ ঘণ্টা সমান বইবে।

কথাগুলো তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই সুহাসিনী বলিয়াছিল। মনোহর আর একবার আকাশের পানে চাহিয়া গৃহমধ্যে আসিলেন। সেখানেই খাবার দেওয়া হইয়াছিল, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনোহর খাইতে বসিলেন। পাঠরতা লতিকারও চমক ভাঙ্গিল। সেও বই বন্ধ করিয়া ভাইকে ভাল করিয়া শোয়াইয়া দিয়া উঠিয়া আসিল। লতিকা আসিতেই সুহাসিনী বলিল—পড়া শেষ হ'ল এতক্ষণে? এখন যাও একটিবার রান্নাঘরে। ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে বসগে। লতিকা চলিয়া গেল।

আহার্য্যের সম্মুখে পিলসুজের ওপর একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল।

মনোহর গায়ের জামা খুলিয়া খাইতে বসিয়াছিল। সুহাসিনীর চক্ষু হঠাৎ স্বামীর মুখের উপর নিবদ্ধ হইল। কি শীর্ণ সে দেহ হইয়া গিয়াছে। প্রায় চেনা যায় না। অধর মলিন হইয়া গিয়াছে। নাসিকা অসির মত উঁচু হইয়া আছে। দুই পাশের হাড় উঁচু হইয়া আছে। যেন সে মনোহর নয়। পূর্ব্বের সেই স্বাস্থ্য, সেই সৌন্দর্য্য যেন কোথায় চির-বিদায় লইতে বসিয়াছে!

তা হইবে না? এত পরিশ্রমে মানুষের শরীর টিকে? রাত্রে একটু বিশ্রাম ছিল। সেটুকুও গিয়াছে। মাসিক দশ টাকার জন্য সে বিশ্রামটুকু নষ্ট করে' শরীরকে এমন করিয়া কষ্ট দেয়। সাধে কি সুহাসিনী রাগ করে! ১০৲ টাকার জায়গায় যদি ৫০৲ টাকা ঐ বিশ্রামের পরিবর্ত্তে স্বামী আনিয়া দিতেন, তবু সুহাসিনীর রাগ তাহাতে কমিত না। স্বামী তো সেটুকু বুঝেন না তাই তো তাহার দুঃখ।

হঠাৎ মনোহর আহার শেষ করিয়া জলের গ্লাসে হাত দিতে সুহাসিনী বলিল,—ওকি খাওয়ার ছিরি হচ্ছে দিন দিন। সব যে পাতে পড়ে রইল। আর দুটো খাও। এম্‌নি ক'রে শরীর কতদিন বইবে শুনি?

জানত দুঃখীর শরীর না বইলে চলে না—বইতেই হবে, বলিয়া মনোহর উঠিয়া পড়িলেন। তারপর হাত মুখ ধুইয়া কক্ষে আসিয়া ইতিহাসের পাণ্ডুলিপির খাতা লইয়া বসিলেন।

সুহাসিনী খানিকটা উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তারপর উচ্ছিষ্টাদি কুড়াইয়া থালা উঠাইয়া যখন বাহিরে আসিল তখন তাহার দুই চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিতেছে আর অন্তরের মধ্যে অভিমানের প্রবল ঝটিকা বহিতেছে।

মনোহর কিছুক্ষণ ধরিয়া লিখিয়া গেলেন। একবার লেখা বন্ধ করিয়া লক্ষ্য করিলেন—সুহাসিনী এখনও কক্ষে আসিল না, আবার খানিকটা লিখিয়া গেলেন, তথাপি সুহাসিনীর দেখা নাই। অন্য রাত্রে তাঁহার আহার সারিয়া আসার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সুহাসিনী কার্য্য সারিয়া আসিত। কিন্তু আজ এত বিলম্বের কারণ কি?

মনোহর লেখা বন্ধ করিয়া উঠিলেন। রন্ধনগৃহের সম্মুখে গিয়া দেখিলেন—উচ্ছিষ্ট থালা বাসন সব ধুইয়া ঘরের এক পাশে সজ্জিত রহিয়াছে। একটু দূরে একখানি ছোট থালায় অনুমান এক ছটাক চালের ভাত, তাহারি উপর একধারে ডালের সামান্য একটু চিহ্ন ও তাহারি কাছে ঈষৎ একটু তরকারি বোধ হয় সুহাসিনীর আহারের অন্য অপেক্ষা করিতেছে। মনোহর সত্য সত্যই শিহরিয়া উঠিলেন। দিনরাত্রি প্রাণান্ত পরিশ্রমে সকলের আহার যোগাইয়া সুহাসিনীকে এই খাইয়া থাকিতে হয়। তখন রাত্রি ১২টা বাজিয়া গিয়াছে, তথাপি এখনও কাজের শেষ হয় নাই। তখনও উনানে তাওয়া চাপানো!

ক্ষিপ্রহস্তে কয়েকখানি রুটি বেলিয়া লইয়া সুহাসিনী তাড়াতাড়ি সেগুলি সেঁকিয়া লইল। তারপর পাত্রাদি সব যথাস্থানে তুলিয়া রাখিয়া যখন খাইতে বসিল তখন তাহার দু'চক্ষে জলধারা। অঞ্চল দিয়া অশ্রুধারা মুছিয়া সুহাসিনী সেই স্বল্প অন্নের দুই মুঠি গলাধঃকরণ করিয়া জলের গেলাস মুখে তুলিল।

মনোহর নিঃশব্দে কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া শয্যার উপর বসিলেন। ঘুরিয়া ফিরিয়া এই কেবল তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এত দুঃখে তিনি সুহাসিনীকে রাখিয়াছেন। তথাপি তিনি বালকের মত অভিমান

করেন। ছোট ছেলে মেয়েরা পাশের শয্যায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, পাশের ঘরে লতিকা, কণিকা ও রামপ্রসাদ ঘুমাইতেছে, তিনি তো ইচ্ছা করিয়াই জাগিয়া আছেন। আর সুহাসিনীকে বাধ্য হইয়া এখনও সংসারের খাটুনি খাটিতে হইতেছে। কয়দিন বেশী সকালে বাহির হইয়াছিলেন, জলখাওয়া তাহার পূর্ব্বে হইয়া উঠে নাই। তাই আজ রাত্রেই আগে হইতে সকলের খাবার তৈয়ারি করিয়া তবে সুহাসিনী খাইতে বসিল ইহা মনে করিতে মনোহরের অনুতাপের সীমা রহিল না।

একটু পরে সুহাসিনী ম্লানমুখে কক্ষে প্রবেশ করিয়া দুয়ার বন্ধ করিল। শয্যায় আসিয়া ছেলেমেয়েদের একটু সরাইয়া ঠিক করিয়া শোয়াইয়া আপন শয্যায় শুইয়া পড়িল। স্বামীর কখন কাজ শেষ হইবে এবং কখন তিনি শুইবেন তাহা তিনিই জানেন। সকাল করিয়া শুইতে বলিয়া কোন ফল নাই জানিয়া ইদানীং সুহাসিনী এ কথা বলা ছাড়িয়া দিয়াছে।

মনোহর আলো কমাইয়া দূরে রাখিয়া দিয়া সুহাসিনীর শিয়রের কাছে বসিলেন ও ধীরে ধীরে বলিলেন, রোজ কি তোমার এই রকম খেয়ে থাকতে হবে? সুহাসিনী চমকিয়া উঠিল। স্বামীর এ কণ্ঠস্বর যেন অনেক দিনের আগেকার—প্রায় ভুলিয়া যাওয়া। এ স্বরে যেন মমতা বুঝি বা হারাণো প্রেমের সুরও একটু মাখানো আছে। তাই প্রথমটা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। খানিক স্তব্ধ থাকিয়া বলিল—কি খেয়ে?

মনোহর স্নিগ্ধ ও অনুতপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, আমি আজ তোমার খাওয়া দেখেছি। এই খাওয়া খেয়ে আর এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে

মানুষের সাধ্য নেই যে মেজাজ ঠিক রাখে। এর উপর আমি তোমায় যে দুঃখ দিয়েছি তার জন্য আমায় মাপ করো।

বলিয়া মনোহর তাঁহার শীতল হস্ত সুহাসিনীর ললাটের উপর রাখিলেন।

বহুদিন—বহুকাল পরে সুহাসিনী যেন স্বামীর প্রেম ফিরিয়া পাইল। স্বামীর হাতখানি দুইহাত দিয়া টানিয়া আপনার বুকের কাছে আনিয়া কি বলিতে গিয়া সুহাসিনী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিল।

[৭]

অমরের অনার্সে বি-এ পাশের খবর আসিল। অমরকে এম-এ ও বি-এল এক সঙ্গে পড়িবার জন্য আবার কলিকাতায় যাইতে হইবে। ছুটির সময়ের অনেকখানি সে লতিকার সাহায্যে কাটাইয়াছে। মাসদুয়েকেই সে লতিকাকে মোটামুটি সংস্কৃত শিখাইয়া দিয়াছে। ম্যাট্রিকুলেসনে যেটুকু জ্ঞানের প্রয়োজন লতিকা তার আপনার পরিশ্রমে ও অমরের সাহায্যে খুব শীঘ্র আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। অমরের বিশেষ ঝোঁক যাহাতে লতিকা প্রাইভেট ম্যাট্রিক দেয়; মনোহরকেও সে বিশেষ করিয়া ইহার জন্য বলিয়াছে এবং তিনিও স্বীকৃত হইয়াছেন।

কলিকাতা যাত্রা করিবার পূর্ব্বে অমর মনোহরদের বাড়ী বিদায় লইতে আসিল। মনোহর ও সুহাসিনীকে প্রণাম করিয়া ছোটদের আদর

সম্ভাষণ করিয়া লতিকার পড়িবার ঘরে আসিয়া বলিল—লতু, আজ যাচ্ছি।

লতিকা কিছু বলিল না। শুধু তাহার ম্লান মুখ তুলিয়া একবার চাহিল।

অমর বলিল, তুমি বেশ ভাল করে পড়ো। তুমি নিশ্চয়ই ভাল করে পাশ করবে দেখো। আর এক কাজ করো, আমি মাঝে মাঝে তোমাকে অন্যান্য ভাল ভাল মাসিক পত্র ও বই পাঠিয়ে দেব, সেগুলিও পড়ো। পড়্‌বে তো ?

লতিকা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল পড়িবে। মুখে কিছু বলিল না। পাতলা ঠোঁট দুখানি কি যেন বলি বলি করিয়া বার দুই কাঁপিয়া স্তব্ধ হইল।

তখন অমরকেই আবার কথা কহিতে হইল। আজ যাবার সময় একটা কথা না বলে যেতে পারছিনে, লতু! কতবার তো বাড়ী থেকে গেছি, একলাও থেকেছি; কিন্তু এবারকার মত মনের অবস্থা কখনও হয়নি। যেতে ইচ্ছা করছে না। যত ভাবছি এই যাব এই যাব তত মন ছুটে এসে তোমার এই ছোট ঘরখানিতে দাঁড়াচ্ছে। কেবল আমার মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে এক সঙ্গে এক জায়গায় যদি পড়্‌তে পেতাম— পড়ার সার্থকতা দশগুণ বেড়ে যেত।

অমর বাইবে শুনিয়া লতিকার সারা চিত্ত বেদনায় টন্ টন্ করিতেছিল। অমরের এই কথা শুনিয়া তাহার অন্তরের যে অশ্রু বেদনার বাঁধনে বাঁধা ছিল—সে বাঁধন কাটিয়া নেত্রপ্রান্তে দেখা দিল ও মুক্তার মত কক্ষতলে একটার পর একটা করিয়া পড়িল।

চক্ষে জল দেখিলে মানুষের প্রাণে যে আনন্দের বেদনা জাগে অমর তাহা প্রথম প্রত্যক্ষ করিল। প্রথম দর্শনে দুইজনার অন্তরে প্রেম জন্মলাভ করিয়া সাহচর্য্যে বৰ্দ্ধিত হইয়া অশ্রুজলের স্পর্শে অমর হইয়া উঠিল।

অমর বলিল, তুমি চুপ কর লতু। আমি তোমাকে নিয়ম করে চিঠি দেব। তুমি কিন্তু উত্তর দিও! ছুটি পেলেই আবার আমি আস্‌ব।

অমর এবার যাইতে উদ্যত হইল। লতিকা অমরকে প্রণাম করিল ও চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অমর আর একবার ম্লানমুখী লতিকার পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইল। এই তাহার জীবনের প্রথম প্রণয়। প্রণয়ের প্রথম বেদনা! প্রণয়ের প্রথম আনন্দ! বাহিরে আসিয়া অমর লতিকার কক্ষের পানে আর একবার চাহিল। দেখিল লতিকা অশ্রু প্লাবিত নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া আছে। অমরের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। জোর করিয়া মুখ ফিরাইয়া অমর পথ চলিতে লাগিল।

অমর যখন কলিকাতাগামী ট্রেণে আসিয়া উঠিল তখন দুঃখের মধ্যেও অমরের আনন্দের অবধি ছিল না।

মানুষ পথ চলিতে চলিতে কোন জিনিষ কুড়াইয়া পাইয়া যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখার পর যদি সে জানিতে পারে যে সেই কুড়াইয়া পাওয়া জিনিষ অমূল্য রত্ন তখন তাহার যেমন আনন্দ হয়, অমরের আনন্দও আজ সেইরূপ। কতবার দেখা লতিকাকে এবার দেখিবামাত্র অমরের বড় ভালো লাগিয়াছিল। কিন্তু সে যে এত ভালো, সে যে অমৃতের চেয়ে

কল্যাণিকর, চন্দ্রকিরণের চেয়েও স্নিগ্ধ, মধুর সঙ্গীতের চেয়েও মনোরম আজিকার এইক্ষণের পূর্ব্বে অমর তাহার এতটুকুও বুঝিতে পারে নাই। লতিকার কথা—লতিকার নিশ্বাস—লতিকার রূপ তাহার সমস্ত হৃদয় এমন করিয়া জুড়িয়া রাখিয়াছে, যে কথা সে আজি কিছুক্ষণ আগেও বুঝিতে পারে নাই। লতিকা যে তাহাকে মনে রাখিবে, গোপনে তাহাকে ভাবিবে, সেও যে লতিকার স্মৃতি অমূল্য রত্নের মত অন্তরে সংগোপন রাখিবে—এই অভিনব সুখচিন্তায় অমর বিহ্বল হইয়া পড়িল।

মানুষের দৃষ্টিশক্তির যদি সীমা না থাকিত, দূরত্বের ব্যবধান, গৃহবৃক্ষাদির অন্তরাল ও আলোকের অভাব যদি তাহাকে বাধা না দিত, তাহা হইলে অমর দেখিতে পাইত সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া লতিকা তাহারই কথা ভাবিতেছে আর মনে করিতেছে অমর কি ট্রেণে বসিয়া এমনি করিয়া তাহাকে স্মরণ করিতেছে।

[৮]

মাস কয়েক দুঃখ ও পরিশ্রমের মধ্যেও বড় সুখে কাটিল। কিন্তু যেমন আতিশয্য তেমনি অভাবের মধ্যে বুঝি প্রেমের অভিশাপ লুকান থাকে। তাহাই আবার ধীরে ধীরে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি মনোহর বলিলেন, কদিন পরে লতুকে একবার কলিকাতা নিয়ে যাব।

বিস্মিত হইয়া সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করিল, কেন ?

মনোহর বলিলেন, লতুকে এবার ম্যাট্রিকটা দেওয়াব ভাবছি। ক'দিন পরেই পরীক্ষা।

সুহাসিনীর রাগ হইল যে ভিতরে ভিতরে এত সব ব্যবস্থা হইয়াছে, অথচ তাহাকে একবার বলাও দরকার বলিয়া মনে হয় নাই। বলিলেন—তা মেয়ে পাশ করে কি করবে ! পয়সা আন্‌বে !

মনোহর বলিলেন—তা যদি আনে তাতে ক্ষতি কি ?

সুহাসিনী। মেয়ে চাকরি ত কর্‌বে ! বিয়ে দিতে হবে না ত ?

মনোহর। বিয়ে দিতে হবে না তা বল্‌ছিনে। তবে ম্যাট্রিক পাশ করিয়েও বিয়ে দেওয়া তো যায়। আর ধর যদি বিবাহ সময় মত দিতে পারলাম না বা তার আগে হঠাৎ মারা গেলাম, সে সময়ে লতু যদি চাকরিই করে তা হলে যে দুঃসময়ে সাহায্যই হবে।

সুহাসিনী একথা শুনিয়া যেন তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, থাক্, এত দরদ দেখাতে হবে না—বলে উনি আমার দুঃখ দূর করলেন বড়, তার মেয়ে পাশ করে দুঃখ দূর করবে—পোড়া কপাল !

মনোহর বলিলেন, তুমি কেন এতে এত রাগ করছ বুঝতে পারিনে। আমি কিছু মন্দ ভেবে একথা বলি নেই।

সুহাসিনী। না তোমার খুব দয়ার শরীর, তাই খুব ভাল ভেবে এ কথা বলেছ। তবে আমার ভালোর জন্যে দয়া করে তুমি অত ভেব না ; আমার অত ভালোর দরকার নেই।

বলিয়া উদ্গত অশ্রু গোপন করিবার জন্য সুহাসিনী সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

যথা সময়ে পরীক্ষা আসিল। মনোহর লতিকাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া পরীক্ষা দেওয়াইয়া আনিলেন।

সংসার যেমন চলিতে থাকে তেমনই চলিতে লাগিল। সুহাসিনী মেয়ের লেখাপড়া করা, পরীক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে ভুলেও একটি কথা উচ্চারণ করিলেন না। মাস কয়েক পরে পরীক্ষার ফল বাহির হইলে জানা গেল যে লতিকা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

লতিকা মায়ের চরণে প্রণাম করিয়া বলিল, মা, আজ পাশের খবর এল, আজও কি মা রাগ ভুলে গিয়ে একটি আশীর্ব্বাদ করবে না?

সুহাসিনী একবার কি ভাবিলেন। তারপর লতিকার মাথায় হাত দিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও তাহাকে উঠাইয়া বুকের কাছে ক্ষণকাল রাখিয়া বলিলেন, রাগ কেন মা, আশীর্ব্বাদ করছি, মা তোরা সবাই সর্ব্ব-সুখে সুখী হ'স যেন।

সঙ্গে সঙ্গে লতিকার শিরে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। কোথায় যে সুহাসিনীর রাগ সে কথা তো মেয়ে বুঝে না, আর মেয়েকে সে কথা বুঝাইয়া বলা যায় না।

সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ হইয়াছিল মনোহরের। মনোহর মনোমধ্যে কয়েকটী বাসনা সংগোপন রাখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটী হইতেছে মেয়েদের শিক্ষিতা করিয়া যাওয়া। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শিক্ষার সোপানে উঠিয়াছে ইহাই তাঁহার আনন্দের কারণ।

রাত্রে মনোহর অন্যদিন অপেক্ষা একটু প্রফুল্লভাবে এবং অন্যদিনের চেয়ে একটু আগে গৃহে ফিরিলেন। সুহাসিনীকে বলিলেন, দেখ অত বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ ক'র না, ওতে শরীর টিক্‌বে না।

সুহাসিনী বলিলেন, তোমার নিজের বেলায় সে কথা মনে থাকে না কেন?

মনোহর বলিলেন, তোমাকে সব কথা আমি বুঝিয়ে বল্‌তে পারছিনে—তাই তুমি ভাব্‌ছ আমি অন্যায় করে বেশী খাটছি। একদিন সময় এলে বুঝ্‌বে আমি একটুও অন্যায় করছিনে। এক-দিন ছিল আমার কথা তুমি বিনা তর্কে মেনে নিতে, আজকের একথাটীও যদি সেইভাবে মেনে নেও আমি সেটা অনুগ্রহ বলে মান্‌বো।

সুহাসিনী ঈষৎ বিরক্তির সহিত বলিলেন, থাক্‌, আর 'অনুগ্রহ' ইত্যাদি বলে নিগ্রহ করো না। জানই ত আমি তোমাদের মত শিক্ষা পাইনি।

ইহার পর আর কোন কথা হইল না। কিন্তু তর্ক করিলেও সুহাসিনী অন্যদিনের চেয়ে শীঘ্র করিয়া কাজ সারিয়া শয়ন-কক্ষে আসিল।

মনোহরের শীর্ণ মুখে আজ প্রসন্নতা ফুটিয়াছে। সুহাসিনীকে কাজ সারিয়া আসিতে দেখিয়া মনোহর বলিলেন, এত বলে কয়েও যে আজ একটু শীঘ্র করে এসেছ সেও ভাল। তর্ক করা তোমার একটা স্বভাব।

সুহাসিনী শয্যার উপর উঠিয়া বলিলেন, তা তো বটেই। তুমিই তো আমাকে তার্কিক করেছ—চিরদিন কি আমি এমনি ছিলাম?

মনোহর বলিলেন, দেখ আজ আর ঝগড়া কোরো না। দুটো কথা আমাকে শান্ত হয়ে বল্‌তে দাও; তুমিও শান্তচিত্তে শোন।

সুহাসিনী চুপ করিলেন। শুনিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

মনোহর বলিলেন, দেখ দুটী আশার বশবর্ত্তী হয়ে আমি লতুকে

ম্যাট্রিক পাশ করাবার চেষ্টা করেছি। প্রথম, যৌতুক তো তেমন দেবার ক্ষমতা হবে না—যদি মেয়েকে কিছু শিক্ষা দিলে সস্তায় ও সহজে ভাল পাত্র পাওয়া যায়। দ্বিতীয়, যদি ভাল বিবাহ দিতে না পারি, শ্বশুর-বাড়ীতে কোন রকম আশ্রয় না পায়, মেয়ে নিজের বিদ্যাবুদ্ধির জোরে সৎপথে থেকে নিজের জীবিকা অর্জ্জন করতে পারবে। একটা উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ আমার সফল হয়েছে; আর একটা হচ্ছে ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয়ের ব্যবস্থা। তুমি কিছু মনে ক'রো না—সেটা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সর্ব্বক্ষণ আজকাল এই চিন্তা আমার মনে জাগে—যদি আজ আমার ডাক পড়ে, কাল সকলের কি উপায় হবে। যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন এই চিন্তা দ্বিগুণ হয়। আমি আজকাল যে বেশী খাটছি তার উদ্দেশ্য এই। সকালে ও রাত্রে খেটে আমি যে দশটাকার বেশী উপায় করিনে তা নয়। যে টাকাটা বেশী রোজগার করছি সে টাকাটা ভবিষ্যতের জন্য রাখছি। এর জন্য তুমি কিছু মনে কোরো না। এ কথাও যেন ভেবো না যে তোমার হাতে দিলে তুমি খরচ করে ফেলবে বা নিজে রাখবে এই ভেবে তোমাকে দিচ্ছিনে। এ সংসারে আরও বেশী খরচের দরকার। কিন্তু তাহলে দুর্দিনের উপায় তো কিছু হবে না।

সুহাসিনী সব বুঝিলেন। তাঁহার মনে যে অভিমানের ব্যথা সর্ব্বক্ষণ পীড়া দিত তাহা ইহাতে অনেকখানি কমিয়া গেল। সে স্থানে বরং স্বামীর প্রতি কর্কশ ব্যবহারের জন্য অনুশোচনা জাগিতে লাগিল। এই পর্য্যন্ত শুনিয়া বলিলেন, তুমি আমার জন্য—আমার ভবিষ্যতের জন্য এই সব করছ—একথা আমাকে বোলো না। ওকথা আমি সহ্য করতে পারিনে।

মনোহর স্থহাসিনীর কথায় ব্যথা বুঝিয়া ধীরে ধীরে সান্ত্বনার সুরে বলিলেন, শুধু তোমার জন্য এ ব্যবস্থা একথা কেন ভাব্ছ। ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না। ধর, এমনই যদি হয় তুমি আমি দুজনকেই যেতে হল, তখন? তখন কে ছেলেমেয়েদের দেখ্বে? তারা যে একেবারে অপার সমুদ্রে পড়্বে।

স্থহাসিনী বলিলেন, অত ভাবলে কি চলে? ও সব ভগবানের ইচ্ছা! তাঁর ইচ্ছার উপর কিছু কিছু ছেড়ে দিতে হয় বৈ' কি।

মনোহর বলিলেন, তা হয় জানি। কিন্তু ভগবান্ যে এই জন্যই মানুষকে শক্তি দিয়াছেন। শক্তির প্রয়োগ না করলে যে তাঁর কৃপা থেকে বঞ্চিত হতে হবে—এ কথাও ত ভুল্লে চল্বে না। তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর, আমি যা বল্চি সত্য কি না? যদি মন তোমার এ কথায় সাড়া দেয়, তা হলে মুখকে তর্ক কর্‌তে শিখিও না। তবে এটাও তোমাকে জানিয়ে রাখছি যা সামান্য কিছু বাঁচাতে পারছি তা আমি নিজের কাছে রাখছি না—নিজের সঞ্চয়ের শক্তির উপর আমার বিশ্বাস নেই। ঈশ্বর আমার মনের মধ্যে যে টুকু জ্ঞান বুদ্ধি দিয়াছেন তারই বশে কাজ করছি; তোমাকে অবিশ্বাস করছিনে—নিজেও অপব্যয় করছিনে।

সে রাত্রে স্থহাসিনীর অনেক দুঃখ কমিয়া গেল। আনন্দ ও সুখ যেন দুজনেরই মনের বাতায়ন দিয়া সারারাত্রি নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল। যৌবনে যে আনন্দ না পাইলেও যৌবনান্তে ভুলক্রমে অনেকেই যাহা পাইয়াছেন বলিয়া মনে করে, বুঝি আজ এতদিন পরে দুইজনেই স্বপ্নে সেই অজ্ঞাত আনন্দের আস্বাদ পাইল।

[৯]

অমর এই সময়ে কয়েক দিনের জন্য বাগীশদের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিল। গ্রীষ্মের ছুটির সময় সে কিছুদিন অমরদের বাড়ী থাকিয়া যাইবার সময়ে অমরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

বাগীশ অমরের সতীর্থ ও বন্ধু, বাড়ী বিরাজপুর। বাগীশ নামটির একটা ইতিহাস আছে। কলেজে বার্কের Impeachment of Warren Hastings হইতে কয়েক স্থান এমন সুন্দর ভাবে সে আবৃত্তি করিয়াছিল যে, সেই সময় হইতে সে বার্ক আখ্যা লাভ করে। সেই বার্ক হইতে এই বাগীশ নামের উৎপত্তি এবং এই নামেই সে বাহিরে সকলের কাছে পরিচিত।

বিরাজপুরে থাকিতেই সে কাগজে লতিকার পাশের সংবাদ পাইল এবং সেই দিনই বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কেন যে সে যাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে সে কথাটাও বাগীশকে বলিতে হইল। বাগীশ শুনিয়া বলিল, ভাবে বোধ হয় তুমি লতিকার প্রেমে পড়েছ। কিন্তু এ প্রেম নি' ষিদ্ধ নয় ত?

অমর বলিল, কি যে বল তুমি তার ঠিক নেই। তুমি নিতান্তই বাগীশ।

অতঃপর বাগীশ তাহাকে অনিচ্ছায় যাইতে দিল। অপরাহ্ণে বাড়ী পৌঁছিয়া অমর সন্ধ্যায় লতিকাদের বাড়ী উপস্থিত হইল।

মনোহর তখন বাহিরে। সুহাসিনী তাহাকে বসিতে বলিয়া দুই একটি কুশল প্রশ্ন করিয়া সংসারের কাজে গেলেন। অমর ঘরে আসিয়া বসিল। কথিকা, যূথিকা, রামপ্রসাদ কিছুক্ষণের জন্য অমরকে ঘিরিয়া রহিল। সর্ব্বশেষে লতিকা খোকাকে কোলে করিয়া আসিল। একটু পরে কথিকা মায়ের সাহায্যের জন্য উঠিয়া গেল। যূথিকাও তাহার অনুসরণ করিল। রামু পড়িতে গেল।

অমর বলিল, দেখ লতু, আমি বলেছিলাম না যে তুমি নিশ্চয়ই ভাল ক'রে পাশ করবে?

লতিকা বলিল, একে আর ভাল ক'রে পাশ করা আজকাল বলে না। ফাষ্ট ডিভিজনে পাশ করা আজকাল অতি সাধারণ।

অমর। তা হোক। আমার বিশ্বাস তুমি যদি কোন স্কুল থেকে পরীক্ষা দিতে তাহলে নিশ্চয়ই বৃত্তি পেতে। প্রাইভেটে দিলে সে সুযোগ নেই।

লতিকা। বৃত্তি না পাই,—আমি যে পাশ ক'রে বাবাকে একটু সুখী করতে পেরেছি এতেই আমি অনেক আনন্দ পেয়েছি।

অমর। সে কথা ঠিক, 'স্যার' এই খাটুনির মধ্যেও যে তোমাকে এই ভাবে পড়াতে পেরেছেন এ তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা।

লতিকা। ঘুমে তাঁর চোখ জড়িয়ে আস্‌ছে—ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে পড়্‌ছে, তবু তিনি বিশ্রাম নেন্‌নি। কিন্তু আমি পাশ ক'রে বাবার কোন দুঃখ দূর করতে পারব না এই আমার দুঃখ। আমি যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতাম তাহলে বাবার অনেক দুঃখ কম্‌ত।

অমর। মেয়ে হয়েও তুমি 'স্যারকে' সুখী করতে পারবে। চেষ্টা ক'রলে কি না হয় ?

লতিকা। কিন্তু আমি তো কোন পথ দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। বাবার দুশ্চিন্তার সীমা সেই, দুঃখের শেষ নেই। তবু সমস্ত দুঃখ তিনি মুখ বুজে সহ্য কচ্ছেন।

আমি সব দেখ্‌ছি, সব বুঝ্‌ছি—অথচ কিছুই ক'রতে পার্‌ছি নে, বরং দিন দিন তাঁর দুশ্চিন্তা বাড়িয়েই তুল্‌ছি।

শেষের কথাটা বলিয়া লতিকা মুখ নত করিল। অমর লতিকার লজ্জিত মুখভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল, লতু, তুমি মিথ্যা ক্ষোভ কোরো না; মিথ্যা লজ্জা পরিত্যাগ কর। বরং যাতে তুমি সংসারের সাহায্য কর্‌তে পার তারই চেষ্টা কর।

লতিকা মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, কি ক'রে করব, তুমি ব'লে দাও, অমর-দা। তুমি ছাড়া ভরসা দেবারও তো কেউ নেই আমাদের।

অমর একটু ম্লান হাসিয়া বলিল, আমি আর কি করতে পার্‌ছি লতু। স্যারের কাছে যে অমূল্য জিনিষ পেয়েছি তার জন্য চিরজন্ম যদি তাঁর সেবা করি, তাহলেও বেশী কিছু করা হয় না। তাঁর কাছে যে শুধু জ্ঞান বা শিক্ষা পেয়েছি—তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্নেহও পেয়েছি। সে স্নেহ যে কি তাতো তুমি খুব জান।

লতিকা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে অমরের পানে চাহিয়া বলিল, তুমিই তাহলে বলে দাও কি ক'রে আমি বাবার অন্ততঃ কিছু দুঃখ লাঘব করতে পারি।

অমর বলিল, তাঁর দুঃখ বা দুশ্চিন্তা সবই তো তোমাদের জন্য।

তোমরা যদি স্বাবলম্বন শিখতে পার, ভাল ক'রে শিক্ষা লাভ ক'রতে পার, তাহলে তাঁর দুর্ভাবনাও সেই পরিমাণে অনেকটা কমে যাবে।

লতিকা। ম্যাট্রিক পাশ ক'রে মেয়ে মানুষে কি করবে বল। ছেলে যদি হতাম একটা তবু ১৫৲।২০৲ টাকার চাকরি করেও বাবার একটু সাহায্য করতে পারতাম।

অমর। তুমি উতলা হোয়ো না। এই অবস্থাতেই তুমি যে সাহায্য করতে পার আমি সেই কথাই তোমাকে বলছি। আই-এর বই সবই আমার কাছে আছে। দুই একখানা মাত্র বদলেছে। সেগুলো সব ধীরে ধীরে পড়তে থাক; বাকিগুলোও আমি সব এনে দেব। কিছু বাইরের বইও পড়ার দরকার। সে বইও আমি যোগাড় ক'রে দেব। ঠিক দু'বছর পরে আই-এ দেওয়া চাই। তোমার Substance (সারাংশ) লেখবার বেশ হাত আছে। ও অভ্যাস রাখবে।

লতিকা। তা যেন করলাম। কিন্তু মায়ের যে আর বেশী পড়ায় আপত্তি।

অমর! কেন? কাকীমা কি বলেন?

লতিকা। মা বলেন, আর পড়লে লাভ তো নেই, বরং অলাভ আছে।

অমর। কাকীমা একথা বলেন কেন?

লতিকা। মা বলেন, আমাদের গৃহস্থের সংসার এইটুকু শিখেই বিপদ; এর চেয়ে বেশী শিখলে—বলিয়া লতিকা লজ্জায় চুপ করিল।

অমর। এ তোমার সেই 'দুর্ভাবনার' কথা। তা আমাদের সমাজ হিসাবে কথাটা ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু কেন এমন হয়—আমি তাই

ভাবি। শিক্ষা যদি গুণ হয় তা'হলে গুণবতী মেয়েদের আদর কেন বাড়ে না আমি তা বুঝ্‌তে পারিনে।

লতিকা। মা বলেন, শিক্ষা মানে তো কেবল পাশ করা বা ইংরাজী শেখা নয়। শিক্ষা মানে সকল বিষয়ের জ্ঞান। গৃহস্থ ঘরের মেয়ে সংসারের সব শিখ্‌তে হবে; শুধু বইয়ের বিদ্যা শিখ্‌লে হবে না।

অমর। এ ঠিক কথা। কিন্তু তুমি তো সংসারের সব শিক্ষা পেয়েছ।

লতিকা। মা বলেন, সে কথা তো বাইরের লোকে জান্‌বে না। তারা ভাব্‌তে পারে মেয়ে হয়ত ইংরিজী বই দু'খানা পড়ে একেবারে বিবি হ'য়ে গেছে। আর যাঁরা একথা ভাবেন না তাঁদের কাছে বাবা এগুতে পার্‌বেন না।

অমর। কারও কাছে যদি এগুতে না হয় লতু?

লতিকা একবার অমরের পানে মুখ তুলিয়া চাহিল; তারপর আনন্দে ও লজ্জায় মাথা নীচু করিল।

অমর আবার বলিল, কেউ যদি নিজে সেধে আসে লতু—তাহ'লে কি তার কথা রাখ্‌বে?

লতিকার সর্ব্বদেহ আনন্দের আবেশে কাঁপিতেছিল। অমরের ভয় হইল পাছে লতিকা পড়িয়া যায়। সে ব্যস্ত হইয়া লতিকার একখানি হাত হাতের মধ্যে লইয়া চুপি চুপি বলিল, লতু, শান্ত হও। আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। তোমায় কিছু বল্‌তে হবে না।

লতিকা ধীরে ধীরে শান্ত হইল, কি একটা বলিতে গেল। কিন্তু তাহার কথা কণ্ঠের মধ্যে ও অমরের কথার যে সুর তাহার কাণে বাজিতেছিল সেই সুরের মধ্যে হারাইয়া গেল।

মনোহর যখন নরহরির দোকানে খাতাপত্র লিখিয়া ফিরিয়া আসিলেন তখন অমর বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে। আজ অমর ও লতিকার মুখ যেন আনন্দে উদ্ভাসিত বলিয়া মনে হইল। লতিকার পরীক্ষা সাফল্যের জন্য তাঁহার মনেও কম আনন্দ হয় নাই। কিন্তু ইহাদের আজিকার আনন্দ যেন অন্তবিধ। ইহার মূল যেন আরও দূরে—হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে।

মনোহরের আজ হঠাৎ মনে হইল, ইহাদের দুটীতে যদি বিবাহ হয় তো কি সুখের হয়! দুজনেই দুজনের সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত।

অমর জিজ্ঞাসা করিল, স্যার! আপনার বইয়ের আর কত দেরী? মনোহর বলিলেন, Historyর Note তো শেষ হয়েছে! কিন্তু Text-book এখনও বাকি আছে খানিকটা। ভাবছি এখানা শেষ হ'লে একসঙ্গে দুখানাই তোমার হাতে দেব।

অমর বলিল, Note যে কোন সাধু প্রকাশককে দিয়ে ছাপানো যেতে পারে।

Text-book প্রকাশ করতে গেলে নামজাদা প্রকাশক চাই। আমি ২।১ দিনের মধ্যে একবার কল্‌কাতা যাব, আপনার নোটখানি আমাকে দিন। এবারেই চেষ্টা করে আসব। কিন্তু Text-book খানিও শীঘ্র

শেষ ক'রে ফেলুন। ওখানা আবার টাইপ করিয়ে তবে দিতে হবে। নামজাদা প্রকাশকেরা আবার হাতের লেখা পছন্দ করেন না।

মনোহর বলিলেন, তাই দেব। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে শেষ হবে মনে হয়। নোটখানা তাহলে এখনি নিয়ে যাবে ?

অমর বলিল, তাই দিন্।

মনোহর লতিকাকে বলিলেন, মা, সেই নোটখানা অমরের হাতে দাও তো।

লতিকা পিতার ঘর হইতে পাণ্ডুলিপিখানি আনিয়া অমরের হাতে দিল।

অমর পাণ্ডুলিপি হাতে করিয়া লতিকার হাতের মধুর স্পর্শ টুকু ভাবিতে ভাবিতে গৃহের দিকে যাত্রা করিল।

মনোহর বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এরা দুজনা দুজনের যোগ্য। প্রতিবন্ধক একমাত্র আমার দারিদ্র্য। কিন্তু অমরের পিতা সদাশয় লোক। তিনিও কি সাধারণ লোকের মত কন্যার পিতার দারিদ্র্যকে একটা প্রতিবন্ধক মনে করিবেন ? হয়ত করিবেন না। অবশ্য নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না। কিন্তু একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি ? যদি রাজী হন্ তো সব দিক দিয়াই ভাল। লতিকার ভাল বিবাহ হইবে; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অবর্ত্তমানে ছেলেমেয়েদের একজন অভিভাবকও হইবে। মানুষের জীবন সত্যসত্যই পদ্মপত্রের জল। কখন যে শেষ হইবে বলা যায় না। এক এক সময়ে মনে হয় বুঝি আর বেশী দেরী নাই। ইদানীং বুকে এক এক সময়ে একটা বেদনা বোধ হয়। কাহাকেও সে কথা বলেন নাই। ডাক্তারকেও দেখান নাই। কিন্তু আপনি আপনি

মনে হয় ইহা একটি কঠিন রোগের সূচনা। ভবিষ্যতের জন্য সামান্য একটা ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে। কিন্তু ভবিষ্যৎ যে দীর্ঘ এবং ব্যবস্থা যে সামান্য তাহাতে তাঁহার অবর্ত্তমানে সংসারের কতটুকু অভাব দূর হইবে! যদি অমরের পিতা রাজী হন্ সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

রাত্রে আহারাদির পর মনোহর সুহাসিনীর কাছে মনোভাব ব্যক্ত করিলেন।

সুহাসিনী বলিলেন, একথা তোমার আজ মনে হয়েছে; আমি বহুকাল আগে একথা ভেবেছি। তুমি কি ভাববে ভেবে তোমাকে বলিনি।

মনোহর বলিলেন, কাল্‌তো রবিবার, অমরের বাপ বাড়ী থাক্‌বেন। কথাটা কি কালই পেড়ে দেখব ?

সুহাসিনী পরামর্শ দিলেন যে দেখাই উচিত।

এ বিবাহ হইলে কত ভাল হয় দুজনে সে সম্বন্ধেও কথাবার্ত্তা হইল। রাত্রিটা কোন রকমে কাটিয়া গেল। পরদিন সকালে উঠিয়া মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করিয়া মনোহর অমরদের বাড়ীর উদ্দেশে চলিলেন।

রবিবারে ছেলেদের ছুটি। গৃহশিক্ষকদেরও তাই। সমর তাই মাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল। মনোহর হাসিয়া বলিলেন, ভয় নেই, তোমায় আজ পড়তে হবে না। আজ তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

সমর ছুটিয়া পিতাকে খবর দিতে গেল। একটু পরেই চন্দ্রনাথবাবু নামিয়া আসিলেন।

কুশল প্রশ্নাদির পর চন্দ্রনাথবাবু সমরের লেখাপড়া সম্বন্ধে দুই একটি

কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সমর নিজের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা শুনিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেল।

অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর মনোহর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, আমি একটা বিষয়ের জন্য ভিক্ষার্থী হয়ে আপনার কাছে এসেছি।

চন্দ্রনাথবাবু একটু জিজ্ঞাসুভাবে চাহিয়া বলিলেন, কি কথা আজ্ঞা করুন।

মনোহর বলিলেন, আমার বড় মেয়ে লতিকা এবার প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাশ করেছে, শুনেছেন বোধ হয়?

চন্দ্রনাথবাবু স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, হ্যাঁ শুনেছি বৈ কি! বেশ ভাল কাজ করেছেন আপনি। আমার স্ত্রী বলছিলেন এত কাজের মধ্যেও যে আপনি সময় ক'রে মেয়েটিকে পড়াতে পেরেছেন এ আপনার পক্ষে অতি প্রশংসার বিষয়। অমর তো বলে, লতিকা যা শিখেছে তাতে সে আই-এ পাশ একটু চেষ্টাতেই করতে পারে।

মনোহর বলিলেন, আপনার আশীর্ব্বাদ। লতু গৃহকর্ম্ম সব জানে। বড় শান্ত, আর মন বড় উঁচু। এরই জন্য আজ ভিক্ষায় এসেছি। অমর তো আপনার বিবাহযোগ্য হয়েছে। মেয়েটিকে যদি দয়া করে অমরের জন্য গ্রহণ করেন।

চন্দ্রনাথবাবুকে চিন্তিত মুখে নীরব থাকিতে দেখিয়া মনোহর বলিলেন, আপনার অবস্থার সঙ্গে আমার অবস্থার আকাশ পাতাল পার্থক্য আমি জানি। কিন্তু আপনি দরিদ্রকেও ঘৃণা করেন না—সেই ভরসায় আমি আপনার কাছে এই প্রস্তাব করতে সাহসী হয়েছি।

চন্দ্রনাথবাবু বলিলেন, আপনার প্রস্তাবে কোন দোষ হয়নি। লতিকার

কথা আমি সব শুনেছি। অমন মেয়ে পুত্রবধূরূপে পাওয়া ভাগ্যের কথা। তারপর আপনার উপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। আপনার বংশ নির্ম্মল তাও আমি জানি। কিন্তু এর একটা প্রতিবন্ধক আছে। আমাদের যে বংশমর্য্যাদা তার উপর আমাব একটা প্রবল আকর্ষণ আছে। পাল্টি ঘর ভিন্ন আমরা আজ পর্য্যন্ত ছেলেমেয়ের বিবাহ দিই নি। সে জন্য আজ পর্য্যন্ত আমাদের কৌলীন্য ভঙ্গ হয়নি। আপনারা ভঙ্গ, আপনাদের বংশে বিবাহাদি হলেই আমাদিগকেও ভঙ্গ হতে হবে। নৈকষ্যের মর্য্যাদা চলে যাবে। এর যে খুব বেশী একটা দাম আছে, তা নয়। কিন্তু তবু এর মায়া আমি ছাড়্তে পারিনে। আমার বাবা পর্য্যন্ত এই কৌলীন্যকে অব্যাহত রেখে গেছেন। আমিও তাই রেখে যেতে চাই। আমা হতে যে এর ধারা বাধা পাবে এ মনে করতেই আমার অন্তরে ব্যথা লাগে। এ একটা বহুকালকার বদ্ধমূল সংস্কার ছাড়া বেশী কিছু নয়। তবে আপনি তো জানেন সংস্কারের শক্তি কত বিশাল।

বলিয়া চন্দ্রনাথবাবু সত্য সত্যই হাত যোড় করিলেন।

আশাভঙ্গের গভীর ব্যথা মনোহরের মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, আমি একথা বুঝ্তে পারিনি। আমার ধারণা ছিল মেয়ের বিবাহ দিতেই আপনাদের সমান ঘরের প্রয়োজন। আমায় ক্ষমা করবেন।

মনোহরবাবু উঠিয়া হাত যোড় করিয়া বলিলেন, আপনি একথা বল্বেন না। আমি আপনার কথা সব বুঝেছি। এর জন্য আপনার দোষ দিতে পারিনে। অনেক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মানুষের সব আশা সব সময়ে পূর্ণ হয় না এ ব্যাপার তাহারই একটা প্রমাণ। আমি না বুঝে আপনার উদার মনে কষ্ট দিয়েছি সে জন্য আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।

চন্দ্রনাথবাবু সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, লতিকার বিবাহে আমার আর যা সহায়তা সম্ভব হয় আমি তা সানন্দে করব। আমি আজ হ'তে যোগ্য পাত্রের সন্ধানও করতে থাক্‌ব এবং সন্ধান পেলেই আপনাকে জানাব।

"আমি তবে এখন আসি। আপনার দয়া আমি কখন ভুল্‌বো না।" বলিয়া মনোহর ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। মনোভঙ্গের যে ব্যথাটুকু তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল তাহাতে চন্দ্রনাথবাবুকে কাতর করিয়াছিল। কাহাকেও নিরাশ করা তাঁহার স্বভাব নহে। আজ কিন্তু স্বভাববিরুদ্ধ কাজ তাঁহাকে করিতে হইয়াছে, তাই তিনি ক্লিষ্ট ও চিন্তান্বিত মুখে ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। মনোহরের কাতর ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক মুখমণ্ডল সত্যই তাঁহার উদার ও দয়াশীল হৃদয়কে পীড়া দিতেছিল।

[১৯]

স্বামীর মুখের ভাব দেখিয়া না জিজ্ঞাসা করিয়াও সুহাসিনী বুঝিয়াছিলেন স্বামীর চেষ্টা সফল হয় নাই। তথাপি জিজ্ঞাসুভাবে মুখের দিকে চাহিতে মনোহর বলিলেন—কিছুই হ'ল না।

সুহাসিনী বলিলেন—রাজী হ'লেন না? কি বল্লেন?

মনোহর হতাশার সহিত বলিলেন, তাঁরা নৈকষ্য কুলীন, ভঙ্গের সঙ্গে কায করতে অনিচ্ছুক।

সুহাসিনীর মুখভাব একটু কঠিন হইয়া উঠিল। বলিলেন, সত্যিই কি এই আপত্তি—না ভেতরে টাকার খাঁই আছে?

মনোহর বলিলেন, না, তা নেই। তিনি যে সব কথা বল্লেন, তা আন্তরিক ভাবেই বল্লেন। লতুর বিবাহে আর যা সহায়তা দরকার হয় তা তিনি আনন্দের সঙ্গে করবেন—এসব কথাও বল্লেন।

সুহাসিনী অবসন্ন মুখে বলিলেন, তবে তো খুবই করেছেন! ওসব ছেঁদো কথা বড়মানুষি ঢং ক'রে বলা। যে উপায় তাঁর হাতের মধ্যে সে উপায়ে সাহায্য করতে পারবেন না, আর অন্য উপায়ে সাহায্য করবার জন্য একেবারে অস্থির। তুমি যেমন তাই ওই কথায় ভুলে এলে।

মনোহর উদাসভাবে বলিলেন, ভুলে না এসে আর কি করতে পারতাম বল? আপনাকে বিয়ে দিতেই হবে নইলে ছাড়্‌ব না—একথা ব'লেও তো কোন লাভ নেই।

সুহাসিনী তিক্ততার সহিত বলিলেন, তা নেই জানি। কিন্তু মাখা-মাখিরও তো কম নেই তাব'লে!

মনোহর একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন, মাখামাখি থাক্‌লেই যে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে এমন কোন বাঁধাবাঁধি তো নেই। মাখামাখি করি নিজের গরজে। তোমাদের জন্যই এসব করতে হয়।

সুহাসিনী তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, 'তোমাদের জন্য তোমাদের জন্য' বারবার একথা কেন বল? ছেলেপুলের জন্য কর তাই বল। ছেলেপুলে আমারও যেমন তোমারও তেমনি।

মনোহরের শরীর ও মন তখন নিরাশার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। ক্লান্তকণ্ঠে কহিলেন, আচ্ছা, স্বীকার করছি 'তোমাদের' বলা অন্যায় হয়েছে। আজ থেকে তোমাদের না ব'লে আমার বল্‌ব। আমি যে রোজ সকালে ছেলে পড়ানো থেকে সন্ধ্যায় দোকানদারের খাতাপত্র লেখা পর্য্যন্ত সব নিজের জন্য করি—এই কথাটাই বল্‌ব ও ভাব্‌ব।

সুহাসিনী বলিলেন, তুমি দোকানে খাতা লেখ কি ওজন কর সে কথা আমাকে শোনানোর কি দরকার! আমি পরণের দুখানা কাপড় আর পেটের দুমুঠো ভাত ছাড়া কখন কিছু চাইনি—পাইওনি। তা আমাকে ওকথা বলা কেন? নিজের দরকার বুঝেছ—করেছ; দরকার বুঝ্‌তে না—করতে না।

মনোহর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, নিজের দরকার কি কার দরকার যে দিন জান্‌বে সে দিন বুঝ্‌বে।

'আমি জান্‌তেও চাইনে, বুঝতেও চাইনে। চিরকাল যা ক'রে এসেছি, আজও তাই করছি।'

বলিয়া সুহাসিনী রাগ করিয়া সেখান হইতে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

মনোহর ভাবিতে বসিলেন। ভাবনার আর শেষ নাই। অন্যদিন স্কুল থাকে, ছেলে পড়ানো থাকে, সময় একরকমে কাটিয়া যায়। কিন্তু আজ চিন্তা ব্যতীত আর কিছুই সম্বল নাই। কোন দিকে সহানুভূতির কোন প্রত্যাশা নাই। কন্যার বিবাহের যৌতুক দিবার ক্ষমতা নাই। সমাজের যে অবস্থা তাহাতে পাত্রাপাত্রের বিচার নাই। পুরুষ হইলেই সে পাত্র—সুতরাং তাহাদের ইচ্ছামতই যৌতুকাদি দিতেই হইবে। না দিলে বিবাহের

উপায় নাই। যে দুর্ব্বল সমাজে তাঁহার বাস তাহাতে এ অবস্থাতেই কন্যার বিবাহ না দেওয়া একটা প্রকাণ্ড অপরাধ—এবং হয়ত বিপদের কথাও বটে। লতিকাকে যদি আর একটু লেখাপড়া শিখাইয়া স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে পারেন হয়ত বিবাহ না করিয়া তাহার জীবিকা সে অর্জ্জন করিতে পারিবে। কিন্তু তাহার ফলে হয়ত কণিকা ও যূথিকার বিবাহ হওয়া দুর্ঘট হইবে।

তাহা ছাড়া গরীবের তাসের ঘরে বাস। যখন এতটুকু বাতাসে ঘর ভাঙ্গিয়া যায় তখন স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের কি হইবে? কাহার আশ্রয়ে তাহারা যাইবে? কে তাহাদের দেখিবে? তাঁহার দারিদ্র্য ও অবিবেচনার জন্য কি স্ত্রী-পুত্রকন্যা তাঁহাকে অভিসম্পাত দিবে না? এত কষ্ট—এত পরিশ্রম করিয়া, এত অভাব সহ্য করিয়া, এত অশান্তির তুফান তুলিয়া ভবিষ্যতের জন্য যেটুকু ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার মূল্যই-বা কতটুকু?

ইতিহাসের বইখানি এখনও শেষ হয় নাই। আর বিলম্ব করা উচিত নহে। আর কাহারও কাছে কোন প্রত্যাশা না করিয়া, নিজের শক্তিতে নিজের সামর্থ্যে যাহা হয় তাহাই আজ হইতে তিনি সম্বল করিবেন। সমরের তিনি গৃহশিক্ষক; ঠিক সেই হিসাবেই সেখানে যাইবেন। মাসিক কয়টি টাকা মাত্র তাঁহার প্রাপ্য। তাহার বেশী কিছু তাঁহার চাহিবার নাই—এই শিক্ষাটুকু সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে। আর গৃহে স্ত্রীর কাছে তিনি কিছু প্রত্যাশা করিবেন না। পুত্র-কন্যাদের কাছেও নয়। কাহারও কাছে প্রত্যাশা না রাখিলে নিরাশার হাত হইতে রক্ষা পাইবেন। দুঃখ কোন প্রকারে সহ্য হইয়া যায়, কিন্তু নিরাশার আঘাত বড় দুঃসহ।

সেদিন তিনি নাম মাত্র আহারে বসিলেন। যাহা পারিলেন দুই মুঠা মুখে দিয়া উঠিয়া পড়িলেন। এইবার স্থির করিলেন আর এক মুহূর্ত্ত সময় অপব্যয় করিবেন না। তাহার পর লেখা লইয়া বসিলেন।

ছত্রের পর ছত্র লিখিয়া চলিলেন। যে বেদনা তাঁহার অন্তরে দারুণ দুঃখ দিতেছিল তাহাই আজ তাঁহার লেখাকে সহজ সুন্দর ও সরল করিয়া তুলিতে লাগিল। যে ইতিহাসকে তিনি চিরদিন খণ্ড বিখণ্ড ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে না করিয়া সমাজের ও দেশের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক বিবরণ—কত শত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনাদির অন্তর্নিহিত নীতিগর্ভ বিরাট্ সত্যের মনোজ্ঞ কাহিনী বলিয়া মনে জানিয়া আসিয়াছেন তাহাই আজ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকরূপে তাঁহার মনোমাঝে উদিত হইয়া মধুর ভাষার বন্ধনে ধরা দিতে লাগিল।

দিন শেষ হইয়া গেল। তবু লেখার বিরাম নাই। দীপ জ্বলিল, প্রাঙ্গণে শঙ্খধ্বনি উঠিল। আকাশে একে একে নীল উজ্জ্বল তারাগুলি ফুটিতে লাগিল, তথাপি মনোহর একটি বারের জন্যও লেখা হইতে বিরত হইলেন না। এক একবার বড় ক্লান্তি আসিলে মনোহর ক্ষণকালের জন্য উঠিয়া কক্ষের মধ্যেই পাদচারণা করিয়া লইলেন। আবার একটু পরে লিখিতে বসিলেন।

রাত্রি ১০টা বাজিয়া গেল। লতিকা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, খাবার দেওয়া হবে ?

মনোহর বলিলেন, আমার খাবারটা এই ঘরেই ঢেকে রেখে তোমরা খেয়ে নাওগে। আমার খেতে আজ অনেক রাত হবে।

লতিকা তথাপি একবার বলিল, ওবেলা তো একেবারেই খাওয়া হয় নি ; খেয়ে নিয়ে কেন লেখনা, বাবা !

মনোহর মুখ তুলিয়া শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বলিলেন, না মা, তাহলে লেখা হবে না। তোমরা আমার খাবার এখানে রেখে খেয়ে নাওগে।

লতিকা আর কিছু বলিতে পারিল না। নীরবে কক্ষত্যাগ করিয়া পিতার রাত্রিকার খাবার আনিয়া ও সযত্নে তাহা ঢাকিয়া রাখিয়া ম্লান মুখে ফিরিয়া গেল।

আর সব ছেলে মেয়েরা আগেই খাইয়া লইয়াছিল। লতিকাকেও মায়ের তাড়নায় খাইতে বসিতে হইল। সে অনেক করিয়া মাকেও খাইবার জন্য অনুরোধ করিল, কিন্তু মা তাহাতে কাণও দিলেন না। কার্য্য শেষ করিয়া তিনি শয়নকক্ষে আসিলেন। মনোহর তখনও ভাবিতেছেন আর লিখিতেছেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে ক্রোধ বা বিরক্তির কোন চিহ্ন নাই।

সুহাসিনী—কক্ষদ্বার অর্গল বদ্ধ করিয়া কোন কথা না বলিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। দুঃখ ও অভিমানে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল। কেন, কিসের জন্য স্বামী এত পরিশ্রম করেন ? দিন নাই, রাত্রি নাই, ছুটি পর্য্যন্ত নাই ! কিসের জন্য, কোন্ আশায় এই অমানুষিক পরিশ্রম স্বামী করিতেছেন ? এত কাজ, এমন জিদ্ যে খাওয়ার পর্য্যন্ত সময় হয় না ? এমন করিয়া তাহাকে কষ্ট দেওয়া কেন ? কি তাহার অপরাধ ? কিসের প্রত্যাশী সে যে এই টাকা উপায়ের 'অছিলা' করিয়া তাহাকে এই শাস্তি

দেওয়া? একদিনের জন্যও কি সে বলিয়াছে যে তাহার এই জিনিষ চাই?

সুহাসিনীর চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। কণ্ঠ ভেদিয়া ক্রন্দন আসিতে লাগিল। ক্রন্দন তিনি দমন করিলেন। শুধু অশ্রুজলে তাঁহার উপাধান সিক্ত হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া চিত্তভার কথঞ্চিৎ লঘু হইলে সুহাসিনী ধীরে ধীরে সজল চক্ষে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

অসাধারণ শক্তি ও উৎসাহে মনোহর লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, যখন ভগবানের কৃপায় কল্পনা ও জ্ঞানের দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে তখন এই সুযোগ—এই দুয়ার বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই সমস্ত লেখা শেষ করিতে হইবে। হয়ত বা এমন সুযোগ আর আসিবে না। মনোহর দ্বিগুণ উৎসাহে লিখিতে লাগিলেন। ক্রমে লেখা শেষ হইয়া আসিল। শেষ পরিচ্ছেদে হিন্দু সভ্যতা, মুসলমান সভ্যতা ও ইংরাজী সভ্যতার বিশেষত্ব ও পার্থক্য অতি সুন্দর ভাষায় বর্ণিত হইয়া পুস্তক সমাপ্ত হইল। এতদিনকার আশা আজ সফল হইল। মনের মতন করিয়া একখানি বই লিখিতে পারিলেন। আনন্দে মনোহরের সর্ব্বদেহ শিহরিয়া উঠিল। মনোহর কলম রাখিয়া দুয়ার খুলিয়া একবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন শেষ রাত্রি। চারিদিকে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না। আকাশে চন্দ্র যেন জ্যোৎস্নাসাগরে ভাসিয়া যাইতেছে। বিগলিত জ্যোৎস্না-ধারায় বৃক্ষ, লতা, তৃণ-মণ্ডিত ধরণীতল সিক্ত, স্নাত, প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া আনন্দের ধারায় মনোহরের সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। এই

আনন্দের ভাগ কাহাকেও দিবার জন্য তাঁহার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তিনি গৃহমধ্যে আসিলেন।

চারিদিক নিস্তব্ধ। বামদিকের শয্যার উপর শিশুপুত্রকে কোলের কাছে লইয়া সুহাসিনী ঘুমাইয়া। শয্যার দিকে চাহিতেই সুহাসিনীর অশ্রু-জলাঙ্কিত ম্লান মুখ মনোহরের চক্ষে পড়িল।

হঠাৎ কে যেন অন্তর হইতে বলিল, এই অভাগিনী নারীর যৌবনাবধি আজ পর্য্যন্ত কি কষ্টে কাটিয়াছে তাহার কোন সংবাদ রাখ? ইহার মুখের কঠিন ভাষাকেই চিরকাল বড় করিয়া দেখিয়াছ; অন্তরের দুঃখ সমুদ্রের পানে তো কোন দিন ফিরিয়াও চাও নাই।

অনুশোচনায় মনোহরের অন্তর ভরিয়া গেল। হঠাৎ বক্ষের বাম দিকে একটি অতি তীব্র বেদনা বোধ হইল। মনে হইল, এই বুঝি তাঁহার শেষক্ষণ। তাহাই কি? যদি তাহাই হয়, আজিকার উচ্চারিত প্রেমহীন কঠোর বাণীই কি সুহাসিনীর প্রতি প্রযুক্ত শেষ বাণী হইবে? তাহা হইলে কি তাহার অবলম্বন হইবে? কি লইয়া সে থাকিবে? যদি আজই এইক্ষণে চিরকালের মত চলিয়া যাইতে হয়, যে চিরদিন-চিররাত্রি তাহার সঙ্গে শুধু দুঃখ ভোগই করিয়া আসিয়াছে তাহার সান্ত্বনার জন্য কি রাখিয়া যাইবেন?

বাম হাতে ব্যথিত স্থানটিকে টিপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হাত দিয়া খাতা হইতে একখানি সাদা পাতা ছিঁড়িয়া মনোহর প্রাণপণ চেষ্টায় লিখিলেন—

সুহাসিনী,

আমাকে ক্ষমা করিও। রাগ করিয়া যাহা বলিয়াছি তাহা আমার অন্তরের কথা নহে। তোমার নিঃস্বার্থ প্রেমপূর্ণ হৃদয় আমি জানি। আজ শেষক্ষণ তোমার মধুর হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আমি দেখিতে পাইতেছি।

সেখানে বিন্দুমাত্র স্বার্থ নাই। আছে শুধু পরিপূর্ণ প্রেম ও স্নেহ। বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে। হয়ত আর দেখা হইল না। কিন্তু জানিও—বিশ্বাস করিও তোমার প্রতি অবিচল প্রেম লইয়া আমি চলিলাম। আমার কঠিন বাক্য, তিক্ত ব্যবহার ক্ষমা করিও। অভাব, দৈন্য, দুঃখ তোমার প্রতি আমার অগাধ প্রেমকে আড়াল করিয়াছিল মাত্র—তাহাকে মলিন বা নষ্ট করিতে পারে নাই। তোমার উপর আমি পুত্র-কন্যাদের ভার দিয়া অনিচ্ছায় চলিলাম। যত দিনেই হউক আবার তোমার সঙ্গে দেখা হইবে।

শেষের দিকটায় মনোহরের লেখা জড়াইয়া আসিল। আর কলম চলে না। কোন রকমে পত্র শেষ করিয়া অত্যন্ত জড়িত অক্ষরে নাম লিখিয়া মনোহর ভাবিলেন যেটুকু ক্ষমতা অবশিষ্ট আছে তাহাতে কি সুহাসিনীর কাছটিতে কোন প্রকারে আপনাকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন না? একবার সেই চেষ্টা করিতে গিয়া বেদনা তীব্রতর রূপে দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উপরকার প্রসারিত পাণ্ডুলিপির উপর তাঁহার শ্রান্ত শির লুটাইয়া পড়িল। আত্মা মুক্তি পাইল।

রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছিল। মুক্ত দুয়ার দিয়া উষার স্নিগ্ধ আলোক আসিয়া তাঁহার লুণ্ঠিত এতদিনকার তাপদগ্ধ দেহে—শীতল হস্ত বুলাইয়া

কিছুক্ষণ পরেই সুহাসিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। চাহিয়া দেখিলেন, মুক্ত দ্বার দিয়া গৃহমধ্যে দিনের আলোক আসিয়াছে, টেবিলের উপর প্রজ্বলিত আলোক ম্লান হইয়া আসিয়াছে, আর স্বামী তাহারি কাছে মাথা রাখিয়া পড়িয়া আছেন। প্রথমটা মনে হইল বুঝি সারারাত্রি লিখিয়া ক্লান্ত হইয়া এইভাবে বিশ্রাম করিতেছেন। সুহাসিনী আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, দেখিলেন স্বামী সেই ভাবেই পড়িয়া রহিলেন। ভাবিলেন, এই ভাবেই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। মনে অনুশোচনা জন্মিল—কেন সারারাত্রির মধ্যে একটিবারও স্বামীকে ডাকেন নাই।

সুহাসিনী উঠিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গায়ে হাত দিয়া ডাকিলেন, উঠে বিছানায় গিয়ে শোও, ওঠো, শুনছ? পরক্ষণে দারুণ ও কঠিন সত্য বজ্রাঘাতের মত সুহাসিনীকে অভিভূত করিয়া দিল। ক্ষণপরে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া সুহাসিনী স্বামীর পদতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

চীৎকারের শব্দে ছেলেমেয়েদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। লতিকা ও রামপ্রসাদ সর্ব্বপ্রথম ছুটিয়া আসিল। পিতামাতাকে তদবস্থায় দেখিয়া তাহারা ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তারপর কাঁদিতে কাঁদিতে দুই জনেরই গায়ে হাত দিয়া ডাকিতে লাগিল। অল্প আভজ্ঞতাতেই দুইজনে

বুঝিল মায়ের মূর্চ্ছা হইয়াছে, পিতা আর উঠিবেন না। দুইজনে চারিদিকে অকুল-পাথার দেখিল।

লতিকা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের মধ্যেই বুদ্ধি করিয়া কহিল, রামু, শীগ্‌গির গিয়ে অমর-দাকে ডেকে নিয়ে আয়। রামপ্রসাদ অশ্রু মুছিতে মুছিতে অমরদের গৃহের উদ্দেশে ছুটিল।

তাহার পর অমর আসিয়া দুইজনের অবস্থা দেখিল। অমরের পিতা চন্দ্রনাথ উপস্থিত হইলেন। প্রতিবেশীরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার ডাকা হইল। তিনি আসিয়া সুহাসিনীর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। মনোহরের দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, তাঁহার মৃত্যু ঘণ্টাখানেক কি কিছু বেশীক্ষণ হইয়াছে। হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াই মৃত্যুর কারণ।

চৈতন্য হওয়ার পর হইতে সুহাসিনী স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। দেখিলে মনে হয় যেন তাঁহার কাঁদিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে।

চন্দ্রনাথবাবু দাঁড়াইয়া থাকিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গ্রামেরই কয়েকটি যুবক ও একজন প্রৌঢ় সৎকারের ভার লইলেন। অমরও তাঁহাদের মধ্যে রহিল।

যাইবার আগে—অমর একখানি কাগজ লতিকার হাতে দিয়া কহিল, এখানি স্যারের চিঠি, রেখে দাও, আমরা বাইরে গেলে কাকীমার হাতে দিও। অধীর হোয়ো না। কথিকার হাতে খোকার ভার দিয়ে তুমি মাকে দেখো। মায়ের কাছে কাছে থেকো। আমি শীগ্‌গির ফিরে আস্‌ব।

মৃতদেহ লইয়া সকলে বাহির হইয়া গেল। ভূমিকম্পের অব্যবহিত পূর্ব্বেও পুঞ্জীভূত উত্তপ্ত বারিরাশি অভ্যন্তরে লইয়া পৃথিবী যেমন শান্তমুখে চাহিয়া থাকে তেমনি সুহাসিনী অন্তরে অবরুদ্ধ শোকরাশি লইয়া প্রস্তরমূর্ত্তির

মত সেই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কথিকা যূথিকা কাঁদিয়া উঠিল, খোকাও না বুঝিয়া সে ক্রন্দনে যোগ দিল। লতিকা ও রামপ্রসাদ সজল নয়নে তাহাদের সান্ত্বনা দিতে লাগিল। সুহাসিনী উদাসদৃষ্টিতে একবার তাহাদের পানে চাহিলেন, আর একবার যেদিকে এইমাত্র স্বামীর মৃতদেহ লইয়া গিয়াছে সেই দিকে চাহিলেন, তারপর ছুটিয়া মৃতদেহের অনুসরণ করিতে গিয়া দুয়ারের ধাক্কা লাগিয়া সেইখানে হতচেতন হইয়া পড়িলেন।

লতিকা ও রামপ্রসাদ সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া আসিয়া মাতার লুণ্ঠিত সংজ্ঞাহীন দেহ ধরাধরি করিয়া কক্ষমধ্যে আনিল। তারপর মাথায় জল ও বাতাস দিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনে চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সুহাসিনী চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন ও ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। রাত্রিকার শয্যা, টেবিলের উপরকার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাগজ-পত্রাদি, পুত্রকন্যাদের উদ্বিগ্ন সজল নয়ন দেখিয়া সব কথা মনে পড়িল। লতিকা সময় বুঝিয়া অমরনাথের দেওয়া সেই পত্রখানি মায়ের হাতের কাছে আনিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল, 'বাবা শেষ পত্রখানি তোমাকে লিখে গেছেন। একটিবার পড়ে দেখ মা।'

সুহাসিনীর মনে পড়িল কাল কত কঠিন কথা স্বামীকে বলিয়াছিলেন ; তাহা ভুলিতে না পারিয়া সেই সব উল্লেখ করিয়াই বুঝি তিনি এই পত্রে অনুযোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কম্পিত হস্তে কন্যার হস্ত হইতে পত্র লইয়া মনে মনে পড়িতে লাগিলেন।

সুহাসিনী,

আমাকে ক্ষমা করিও। রাগ করিয়া যাহা বলিয়াছি তাহা আমার অন্তরের কথা নহে। তোমার নিঃস্বার্থ প্রেমপূর্ণ হৃদয়

আমি জানি। আজ শেষক্ষণে—তোমার মধুর হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আমি দেখিতে পাইতেছি। সেখানে বিন্দুমাত্র স্বার্থ নাই। আছে শুধু পরিপূর্ণ প্রেম ও স্নেহ। বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে। হয়ত আর দেখা হইল না। কিন্তু জানিও, বিশ্বাস করিও তোমার প্রতি অবিচল প্রেম লইয়া—আমি চলিলাম। আমার কঠিন বাক্য, তিক্ত ব্যবহার ক্ষমা করিও। অভাব, দুঃখ, দৈন্য তোমার প্রতি আমার প্রেমকে আড়াল করিয়াছিল মাত্র—তাহাকে মলিন বা নষ্ট করিতে পারে নাই। তোমার উপর আমি পুত্রকন্যাদের ভার দিয়া অনিচ্ছায় চলিলাম। যতদিনেই হউক আবার তোমার সঙ্গে দেখা হইবে।

মনোহর

যাহাতে অনুযোগ, ভর্ৎসনা, হয়ত বা কতকগুলা কটু ও কঠোর কথা পাইবেন ভাবিয়াছিলেন তাহাতে এমন অটল বিশ্বাস ও এমন গভীর প্রেমের স্নিগ্ধ ও সরল অভিব্যক্তি পড়িয়া সুহাসিনীর দুঃখদৈন্য-কঠিন হৃদয় দ্রব হইয়া গেল এবং অন্তরের অবরুদ্ধ শোকরাশি উদ্বেলিত হইয়া নেত্রপথে অশ্রুপ্লাবন ভরিয়া আনিল।

তখন লতিকাকে দুই হাতে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া সুহাসিনী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন। বুঝি এতক্ষণে শান্তি মিলিল।

স্কুলে কয়দিনের বেতন পাওনা ছিল, ছেলে পড়ানোর টাকাও কিছু বাকি ছিল, এবং নরহরি একবৎসরের হিসাব ৭৫৲ টাকার পরিবর্ত্তে আপনা হইতে আসিয়া একশত টাকা দিয়া গেল। তাহাতেই চন্দ্রনাথের পরামর্শে অল্পে শ্রাদ্ধ সারিয়া মাসখানেকের খরচের উপযোগী টাকা হাতে রহিল। সংবাদ পাইয়া রামপ্রসাদের জ্যাঠাও আসিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধের পর তিনি চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, এখানকার কাজ কর্ম্ম সব মিটাইয়া দেশে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল। আর এখানে থাকিয়া কি হইবে?

সংসারের কর্ত্তার মৃত্যু হইলে সর্ব্বপ্রথম এই সংবাদেরই প্রয়োজন হয় যে তিনি কি পরিমাণে অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন। যতই অকাব্য হউক্, ইহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কারণ মানুষ মাত্রেরই সর্ব্বপ্রথম কায তাহার বাঁচিবার চেষ্টা।

চন্দ্রনাথবাবু যেদিন লতিকার সহিত অমরের বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন সেই রাত্রেই মনোহরের মৃত্যু হয়। ইহাতে চন্দ্রনাথবাবুর মনে বড়ই ক্ষোভ হইয়াছিল। কি উপায়ে —এই হতভাগ্য পরিবারের কিঞ্চিৎ উপকার করেন, কি করিয়া এতগুলি ছেলেমেয়ের অন্নবস্ত্র সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন—ইহাই তাঁহার চিন্তা হইয়াছিল। তাঁহারই উপদেশ মত —শ্রাদ্ধের পরদিন অমর আসিয়া সুহাসিনীকে বলিল—বাবা বলে

দিলেন, এখন কি করে সংসার চল্‌বে তাই ভাবার দরকার। স্যার টাকাকড়ি কিছু রেখে গেছেন কিনা, দেশে বিষয়-আশয় কিছু আছে কিনা, ঘর বাড়ীই বা কি রকম, বাবা তাই জান্‌তে চেয়েছেন। আপনি কিন্তু এতে দুঃখ করবেন না, কাকীমা ; বাবা বিশেষ করে এই কথা বলে দিয়েছেন।

সুহাসিনী বিগলিত অশ্রু মুছিয়া বলিলেন, দুঃখ যে এখন ভগবান্ সইতেই দিয়েছেন, বাবা। দেশে বিষয়-আশয় যা আছে তা অতি সামান্য। বাড়ীঘর যে রকম তাতে বাস করা চলে।

অমর জিজ্ঞাসা করিল, তার দাম কত হতে পারে ?

সুহাসিনী বলিলেন, অর্দ্ধেক অংশের দাম এক হাজার টাকা হতে পারে।

অমর একটু সঙ্কোচের সহিত বলিল, লাইফ ইন্‌সিওর ছাড়া আর কোন টাকা বোধ হয় রেখে যেতে পারেন নি ?

সুহাসিনী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, সংসারই কষ্ট-সৃষ্টে চল্‌ত। লাইফ ইন্‌সিওর কোথা থেকে করবেন ?

অমর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, স্যারের লাইফ ইন্‌সিওরেন্স ছিল আপনি জান্‌তেন না কাকীমা ? মায়ের বাক্সটা একবার খুলে দেখ তো লতু,—নিশ্চয়ই পলিসিখানা তাতেই পাওয়া যাবে।

লতিকার কাছেই চাবি ছিল। সে উঠিয়া বাক্সটা খুলিয়া দেখিতে গেল। একটু পরে সত্য সত্যই একখানি পলিসি লইয়া ফিরিয়া আসিল। অমর লতিকার হাত হইতে সেখানি লইয়া পড়িয়া বলিল, স্যার পাঁচ হাজার টাকার ইন্‌সিওরেন্স করে গেছেন। এই মাইনে থেকে যে তিনি এই

ব্যবস্থা করে যেতে পারবেন তা ভাবিনি। কাকীমাকেই nominee করে গেছেন। টাকা তোল্‌বার কোন অসুবিধা হবে না।

কথাটা খুব বড় বা বেশী নহে। একজন স্ত্রীর নামে পাঁচ হাজার টাকা জীবন বীমা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে বিশেষত্বই বা কি? কিন্তু কি করিয়া, কত দুঃখ—কত লাঞ্ছনা সহিয়া, দিবারাত্রি কি কঠিন পরিশ্রম করিয়া স্বামীকে এই টাকার সংস্থান করিতে হইয়াছে তাহা সুহাসিনীই জানেন। তাঁহার মনে পড়িল মৃত্যুর দিনেই তাঁহার একটা কঠিন কথার উত্তরে স্বামী বলিয়াছিলেন, নিজের দরকার কি কার দরকার যেদিন জান্‌বে সেদিন বুঝবে। আজ সে কথা সুহাসিনী মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছে। তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল—কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল।

সুহাসিনীকে নিরুত্তর দেখিয়া অমর তাঁহাকে সাহস দিবার অভিপ্রায়ে কহিল, প্রভিডেণ্ড ফণ্ডে ছয়শ টাকার কিছু উপর আছে। আপাততঃ তাই থেকে সাবধানে খরচ চালাতে হবে। আমরা ভেবেছিলাম স্যার বড় জোর এক হাজার টাকার ইন্‌সিওরেন্স করে গেছেন। বাবা কালও বল্‌ছিলেন, কি ব্যবস্থা করতে পারলে রামু মানুষ হওয়া পর্য্যন্ত কষ্টে-সৃষ্টে চলে যায়। এখন মনে হচ্ছে সে রকম ব্যবস্থা করা কঠিন হবে না।

স্যারের বই দুখানা থেকেও কিছু সংস্থান হবে আশা করা যায়। Noteখানা আমার জানা-শোনা এক প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। তাদের পছন্দ হয়েছে—ছাপাবে বলেছে। আর Text bookখানি স্যার সমস্ত প্রাণ দিয়ে লিখেছেন। অতি সুন্দর হয়েছে। এখানি কোন নামজাদা প্রকাশককে দিতে হবে! বাবাকে আমি এই খবরটা দিয়ে আসি।

বলিয়া অমর ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল।

অমর কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র সুহাসিনী উঠিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। লৌহ-শলাকার মত এই চিন্তা তাঁর হৃদয়ের মধ্যে বাজিতে লাগিল। তুমি এই হতভাগিনীর জন্য এত ভাবিয়াছ, এত পরিশ্রম করিয়াছ অথচ একটা দিনের জন্য কথাটা বল নাই কেন? আমি যে তোমাকে কত কঠিন কথা বলিয়াছি; নিজের দুঃখের কথা ভাবিয়া তোমার দুঃখের কথা যে একটী বারের জন্যও মনে করি নাই। যখন তুমি সংসারের কথা ভাবিয়া সারা হইতেছ তখনও তুমি ঘোর উদাসীন এই কথা মনে করিয়া তোমার প্রতি ঘোরতর অবিচার করিয়াছি। আমি কি করিয়া তোমার বুকের রক্তে সংগৃহীত অর্থে এই তুচ্ছ হীন জীবন ধারণ করিব! এ অভাগিনীকে এত ভালবাসিয়া শেষে তাহাকে এমন শাস্তি দিয়া গেলে কেন?

[১৪]

আর মাসখানেকের মধ্যেই জীবনবীমার টাকা সব পাওয়া গেল। চন্দ্রনাথবাবু সুহাসিনীর নামে ৩০০০৲ তিন হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া দিলেন, দেড় হাজার টাকা নিকটবর্ত্তী একটি পিপ্‌লস্ ব্যাঙ্কে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বেশী সুদে রাখিলেন ও পাঁচশত টাকা সুবাসপুরের এক ধর্ম্মভীরু ব্যবসায়ীকে শতকরা ১৲ এক টাকা সুদে হাণ্ডনোটে ধার দেওয়া হইল। এইভাবে মাসিক প্রায় ৩০৲ টাকা

আয়ের ব্যবস্থা হইল। ইহাতে কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চলিতে পারে বটে, কিন্তু ১০৲ টাকা বাড়ীভাড়া দিয়া থাকা সম্ভবপর নহে। তাহার উপর নিজেদের যে রকমই হউক একটা বাড়ী থাকিতে এ অবস্থায় পরের বাড়ীতে থাকিয়া কি লাভ? ব্যয়-সঙ্কোচ চিরদিনই ছিল, এখন আরও সঙ্কোচ করিতে হইবে। চন্দ্রনাথবাবু দেশে গিয়া থাকিতে পরামর্শ দিলেন। সুহাসিনীও তাহা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। অমরের ছুটিও ফুরাইয়া আসিয়াছিল। স্থির হইল অমর উহাদের দুর্গাপুর পৌঁছাইয়া দিয়া কলিকাতা যাইবে।

মাত্র একজনের অভাবে আজ এত বৎসরের বাসস্থান—এতদিনকার গৃহ এমনি করিয়া চিরদিনের মত ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে। কত আশা বুকে করিয়া সুহাসিনী এই গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সে আশার কতটুকু পূর্ণ হইয়াছিল—কতটুকুই বা অপূর্ণ ছিল তাহার হিসাব না থাকিলেও যে নিরাশার মাঝে তাহাকে বিদায় লইতে হইতেছে তাহার যে শেষ নাই! হউক পরের গৃহ—তবু এই গৃহের মাঝে কত শত স্মৃতি জড়িত আছে। যে স্মৃতি তখন সুখের বলিয়া একটিবারও বুঝা যায় নাই। কিন্তু আজ তাহা হইতে দূরে আসিয়া সে তাহার সত্যকার মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছে। চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সুহাসিনী সুবাসপুর ত্যাগ করিলেন। এতকাল পরে আবার সেই দুর্গাপুর ফিরিলেন।

অমরের সহিত লতিকার বিবাহের প্রস্তাব যে চন্দ্রনাথবাবু খুব ভদ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন তাহা অমর ও লতিকা দুইজনেই জানিত; কিন্তু এতদিন দুজনের কেহই সে প্রসঙ্গের কোন উল্লেখ করে নাই। দুর্গাপুরে একদিন থাকিয়া অমরের কলিকাতা যাইবার কথা। সুহাসিনীর অনুরোধে

অমরকে আরও একদিন থাকিতে হইল। যাইবার দিন অমর সুহাসিনীকে একা পাইয়া বলিল, বাবা আপনাকে একটা কথা বল্‌তে বলেছেন।

সুহাসিনী বলিলেন, কি কথা বল।

অমর মাথা নীচু করিয়া বলিল, লতুর বিয়ের সম্বন্ধ বাবা দেখ্‌বেন, আপনাকেও দেখ্‌তে বলেছেন। আরও বলেছেন লতুর বিয়ের খরচ বাবা দেবেন। আপনি সেজন্য মনে কিছু ভাব্‌বেন না। এ খরচ আপনাকে নিতেই হবে।

সুহাসিনী বলিলেন, তাঁর কোন্ জিনিষটা নিইনি বাবা আমরা। তোমরা ছাড়া আমাদের এখন আর আপনার কে আছে? এখানে কেই বা আমাদিগকে দেখ্‌বে? আর ভাল পাত্র কোথায় বা পাব? তাঁকে বোলো তিনিই যেন দয়া করে একটু সন্ধান করেন।

সঙ্গে সঙ্গে আর একদিনের একটা আশার কথা ভাবিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। ভাবিলেন তেমনি যদি হইবে তো ভগবান্ এমন কেন করিবেন।

লতিকার সহিত দেখা করিয়া অমর বলিল, আমি যাচ্ছি লতু। ঠিকানা রইল, চিঠি দিও। আমি তোমাকে সেদিন যে কথা বলেছিলাম সে সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে নেই। সে কথা তুমি ভুলে যাও। সব কথা তুমি শুনেছ। আমায় ক্ষমা কোরো।

যে ক্ষমা করিবে সে তখন চোখের জলে ভাসিতেছিল। তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখের পানে ক্ষণকাল গভীর দুঃখের সহিত চাহিয়া অমর বলিল, লতু, তুমি কাতর হোয়ো না। তোমার উপর এখন কত বড়

ভার ভেবে দেখ। তুমি ভেঙ্গে পড়্‌লে কি করে চলবে ? স্যার তোমাকে কত যত্নে কত আশায় নিজে শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর সে শিক্ষা ভুলো না।

লতিকা অশ্রু মুছিয়া ধীরে ধীরে বলিল, বাবার শিক্ষা আমার চিরকাল মনে থাক্‌বে। তাঁর সব ইচ্ছা আমি ঈশ্বরের বিধান বলে মেনে নিচ্ছি। তাঁর ইচ্ছা ছিল দরকার হলে আমি যেন স্বাবলম্বন গ্রহণ করতে পারি। এখন তাই দরকার হয়েছে। আমি তাই গ্রহণ করব। আমাকে তুমি একটা কাজ খুঁজে দাও—আমি সেই কাজ নিয়ে থাক্‌ব আর ছোট ভাইবোন্‌দের মানুষ করব। আমি যেমন আছি তেমনি থাক্‌ব। তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ করে যাও, আমি যেন নিজের ধর্ম্ম রাখ্‌তে পারি আর বাবার অতি ক্ষুদ্র ইচ্ছাটি পর্য্যন্ত যেন পূর্ণ করতে পারি।

বলিয়া লতিকা নতজানু হইয়া অমরকে প্রণাম করিল। তারপর উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া দ্রুতবেগে সে কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সজল নয়নে অমর কলিকাতা যাত্রা করিল। দুঃখ ও নিরাশার ভারে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তথাপি কোথা হইতে পিককণ্ঠের সঙ্গীতের মত তাহার ব্যথিত হৃদয়ে আনন্দের স্পর্শ জাগিতেছিল তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতে-ছিল না।

অমর কলিকাতা পৌঁছিবার একদিন পরেই অপ্রত্যাশিতভাবে লতিকার একখানি পত্র পাইল। পরম আগ্রহভরে পত্রখানি খুলিয়া অমর রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়িল,—

শ্রীচরণেষু,

তোমার সাক্ষাতে একটা কথা বলিতে পারি নাই। আজ তাহা লিখিয়া জানাইতেছি।

বাবা আমাকে তোমার হাতে দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। তুমি একদিন হয়ত ভালবাসিয়া আমার এই আভরণশূন্য মলিন ও মাধুর্য্যবিহীন হাত তোমার মধুর সুন্দর দেবদুর্ল্লভ হাত দুখানির মধ্যে লইয়াছিলে। সেদিন হইতে আমি জানিয়াছি ও কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করিয়াছি, তুমি আমাকে গ্রহণ করিয়াছ। এখন লোকচক্ষে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলেও বা আর কাহাকে গ্রহণ করিলেও আমার সে বিশ্বাস ত জীবনে বিন্দুমাত্র শিথিল হইবে না।

ইহার পর, আশা করি, তুমি আমার 'ব্যবস্থা' করিবার জন্য আর ব্যস্ত হইবে না। আমার প্রণাম জানিও।

তোমার চিরজীবনের সেবিকা

লতিকা

পত্র পড়া শেষ হইয়া গেল। তবুও বহুক্ষণ অমরের অশ্রুসজল দৃষ্টি পত্রের উপর নিবদ্ধ রহিল। মন চলিয়া গেল দূর অতীতের মধ্যে যে দিন সে লতিকার অমল-কোমল, সর্ব্বমাধুর্য্যমণ্ডিত হাতখানি বড় ভালবাসিয়া আপনার হাতের মধ্যে লইয়া জীবনের প্রথম প্রণয়বাণী বলিয়াছিল ও যাহাকে বলিয়াছিল সেও বিপুল বিস্ময় ও অপূর্ব্ব আনন্দে অধীর হইয়া আপনার হৃদয়ের দুরু দুরু শব্দের মাঝে জীবনে এই প্রথম প্রেমের অমৃত-মধুর বার্ত্তা শুনিয়াছিল।

[১৫]

সুহাসিনীদের বাড়ী আসা লইয়া মনোহরের দাদা কেদার ও তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে বচসা হইয়া গিয়াছিল। কেদারের স্ত্রী আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে ছেলেমেয়ে লইয়া সুহাসিনী আবার তাহাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া যখন তাহারা শুধু তাহাদের বাড়ীর অংশ লইয়া পৃথক্ আহারাদির ব্যবস্থা করিল তখন অশান্তির আশঙ্কা অনেকটা কমিয়া গেল। এমন কি কেদারের স্ত্রী নিরাপদে এ কথাটাও কয়েকদিন বলিলেন, আগেকার মত এক সঙ্গে থাকলেই হ'ত, বিশেষ যখন ঠাকুরপো নেই। দু-পাঁচ টাকা যা আছে বাঁচত। মেয়েগুলোর বিয়েও দিতে হবে। সুহাসিনী অবশ্য সেটা মাত্র মুখেরই কথা মনে করিয়া লইয়াছিলেন এবং নিজের সংসার নিজেই কষ্টে-স্বষ্টে চালাইতে লাগিলেন। কাজেই সংসার অশান্তির হাত হইতে অনেকটা বাঁচিয়া গেল।

গোলযোগ ঘটিল লতিকাকে লইয়া। লতিকার বয়স সতেরো পার হইয়াছিল ও সে ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছিল। তাহার উপরে বিবাহের কোন কথাবার্ত্তা হইতেছিল না।

প্রতিবেশীদের কথায় এবং স্ত্রীর গঞ্জনায় কেদার ২।১টা সম্বন্ধ আনিয়া হাজির করিল। কিন্তু তাহারা আসিয়া শুধু মিষ্টান্ন খাইয়াই চলিয়া গেল। লতিকা কিছুতেই তাহাদের সম্মুখে বাহির হইল না। শেষে কেদারকে

বলিতে হইল মেয়ের জ্বর হইয়াছে। তারপর তিনি রাগ করিয়া এ চেষ্টা ত্যাগ করিলেন।

সুহাসিনী লতিকাকে বলিলেন, এ রকম জিদ্ করলে কি করে চল্‌বে মা? মেয়ে মানুষ হয়ে যখন জন্মেছিস্ তখন বিয়ে তো করতেই হবে। অনর্থক এ লোকনিন্দা কেন মা?

লতিকা বলিল, তুমি তো জান মা, বাবার ইচ্ছা ছিল যে যদি দরকার হয় আমি যেন নিজের ভার নিজে নিতে পারি। বাবার অবর্ত্তমানে সে দরকার আরও বেশী হয়েছে। রামু এখনও ছেলে মানুষ; খোকার কথা তো ছেড়েই দাও। ওদের সব লেখাপড়া শেখাতে হবে। কথিকা, যূথি সবারই ভার তোমার উপর। এ সময়ে তোমাকে ছেড়ে যাওয়া কি উচিত মা? আমি কাছে থাক্‌লে তোমার কি একটু ভাল লাগ্‌বে না?

সুহাসিনী স্নেহস্বরে বলিলেন, তুই তো সংসারের সবই কচ্ছিস মা! আমি তো আজকাল কিছুই পারিনে কত্তে। তুই গেলে কি করে সংসার চল্‌বে এই ভেবে আমি সারা হচ্ছি। কিন্তু তোকে তো যেতেই হবে মা!

লতিকা বলিল—কেন হবে মা? আমি যদি তোমার ছেলে হতাম তাহলে কি তোমায় এ সময়ে ফেলে চলে যেতাম?

সুহাসিনী বলিলেন, তা যেতিস্ নে। কিন্তু ছেলের এক পথ—মেয়ের যে আর এক পথ মা! বিয়ে হলেই যে তুই আমাকে দেখ্‌তে পারবি নে তারই বা ঠিক কি? তখন হয়ত আরও ভাল করে পারবি।

লতিকা বলিল, সে কথা বল না, মা। ক'জন মেয়ে বিয়ের পর তাদের মা বাপকে দেখ্‌তে পারে বলত? ছেলের পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি বড় গুণ, কিন্তু মেয়ের বেলায় তা দোষ হয়ে দাঁড়ায়। মা বাপকে যে যত ভুল্‌তে পার্‌বে, সে তত ভালো বৌ হবে—তা তো জান, মা।

সুহাসিনী একটু গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহলে তুই কি করতে চাস্‌ স্পষ্ট করে বল।

লতিকা বলিল, দুটো বছর পরে রামু ম্যাট্রিক দেবে। এখন থেকে চেষ্টা করিলে যূথিও দিতে পারে। তখন কি মা এই ২৫৲ টাকায় চল্‌বে! না, পয়সার অভাবে রামু লেখাপড়া শিখ্‌তে পাবে না—সেই ভাল হবে? আমি আস্‌ছে বছর আই-এ দেব। দিয়ে একটা কাজের চেষ্টা কর্‌ব। যদি ২৫৲ টাকাও আনতে পারি রামুর কলেজের খরচ চল্‌বে।

সুহাসিনীর চোখে জল আসিল। বলিলেন, তাহলে তোর জীবনে কি হ'ল মা? তোর জীবন যে একেবারে ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

লতিকা মায়ের চোখের জল মুছিয়া বলিল, কেন ব্যর্থ হবে মা? সংসারে কতজন পরের জন্য পরিশ্রম করছে—ত্যাগ কর্‌ছে। কোন মেয়ে যদি বিয়ে না করে মা বাপের সেবা করে তাতেই তার জীবন কেন সার্থক হবে না মা? আমি ত চুপ করে বসে থাক্‌তে চাইছি না।

সুহাসিনী মেয়েকে কোলের কাছে টানিয়া বলিলেন, মায়েরও তো মেয়ের উপর কর্ত্তব্য আছে। মায়েরও তো মেয়ে-জামাই নিয়ে সংসার করতে সাধ যায়।

লতিকা বলিল, সে সাধ তুমি কথিকে নিয়ে—যূথিকে নিয়ে মিটিও মা। আমায় তুমি ছেলের মত তোমার সেবা করবার অধিকার দাও, তাতেই আমার সুখ হবে। তোমার কাছ থেকে আমায় সরিয়ে দেবার চেষ্টা করো না।

মায়ের বুকের উপর মাথা রাখিয়া বলিতে বলিতে লতিকা কাঁদিয়া ফেলিল। সুহাসিনী কন্যার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া সজল নয়নে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

[১৬]

পর বৎসর লতিকা প্রথম বিভাগে আই-এ পাশ করিল। ইহার কয়েক মাসের মধ্যেই পূর্ব্ববঙ্গের একস্থানে সে বালিকাদের মধ্য-ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ পাইল। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিয়া সে সাধারণ ভাবে আবেদন পাঠাইয়াছিল। যে দিন তাহার নামে ৪০৲ টাকা বেতনের নিয়োগ পত্র আসিল সেদিন আর তাহার আনন্দের অবধি রহিল না। এতদিনে সে তাহার দুঃখিনী মাকে সত্যকার সাহায্য করিতে পারিবে, ছোট ভাই বোনদের খাইবার পরিবার দুঃখ কিছু দূর করিতে সমর্থ হইবে। রামুর উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাও বোধ হয় হইবে।

অজানা নূতন পথে চলিতে হইবে; নূতন স্থানে অজানা লোকের সঙ্গে পরিচয় করিতে হইবে, নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে, নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া নূতন কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। কত লোকে মন্দ বলিবে—নিন্দা করিবে। তথাপি এই পথই তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

লতিকা এই বয়সে চাকরি করিতে যাইবে শুনিয়া কেদার রুষ্ট হইলেন, কেদারের স্ত্রী কথা বন্ধ করিলেন, প্রতিবেশীরা নানা কথা বলিতে লাগিল। এই অপ্রসন্নতার মধ্যে রামপ্রসাদকে সঙ্গে লইয়া লতিকা মাতার আশীর্ব্বাদ ও আপনার মনের বল সম্বল করিয়া কার্য্যস্থানে যাত্রা করিল।

নূতন স্থানে পৌঁছিয়া লতিকা দিন দুই একটু অন্যমনা হইয়া রহিল। বিদ্যালয় সংলগ্ন বাসগৃহ ও একটি দাসী পাওয়া গেল। একটি বৃদ্ধ ভৃত্য রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করিবার উপযুক্ত। বিদ্যালয়ে আরও দুইজন শিক্ষয়িত্রী আছেন, একজন বৃদ্ধ শিক্ষক আছেন যিনি বহু বৎসর হইতে ছোট ছোট মেয়েদের স্থানীয় জমিদারের একটা বড় দালানে পড়াইতেন।

লতিকা শুনিল এই বিদ্যালয়ের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনি নানা দেশ ঘুরিয়া সম্প্রতি ফিরিয়াছেন। অতি সজ্জন লোক, সাধু প্রকৃতি। তাঁহারই টাকায় বিদ্যালয়ের সব। তিনি নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন; যথেষ্ট নগদ টাকাও স্কুলের নামে জমা করিয়া দিয়াছেন; যাহার সুদ ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বিদ্যালয় চলিয়া থাকে। ইহা ছাড়া দরকার হইলেই বিদ্যালয়ের মঙ্গলের জন্য এখনও টাকা দিয়া থাকেন।

এত করিয়াও বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বভার তিনি কমিটির উপর স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু কমিটির একান্ত আগ্রহে তাঁহাকে প্রেসিডেণ্ট থাকিতে হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের উপর তাঁহার এমন একটা আন্তরিক আকর্ষণ আছে যে অর্থসাহায্য ছাড়াও যখন যে সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহা দিবার জন্য তিনি সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত রহিতেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীদের জন্য শিক্ষা সম্বন্ধীয় ভাল ভাল বই, ছাত্রীদের জন্য চিত্তাকর্ষক ও সুন্দর আদর্শ সম্বলিত পুস্তক দিয়া যাইতেন; স্ত্রীশিক্ষার জন্য যাহা তিনি অন্তরে উপলব্ধি করিতেন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদিগকে তাহা অসঙ্কোচে বলিতেন।

বৃদ্ধ শিক্ষকটি লতিকার অল্প বয়স, স্নিগ্ধ মূর্ত্তি ও বিনম্র কথাবার্ত্তা দেখিয়া আপনা হইতে বলিলেন, মা, আপনি একটিবার আশুতোষবাবুর সঙ্গে আজই দেখা করে আসুন। তিনি এখন এখানে আছেন, আবার হয়ত চলে যেতে পারেন। বিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁর কাছে আপনি অনেক দরকারী উপদেশ পাবেন।

লতিকা বলিল, আপনি যদি সঙ্গে করে নিয়ে যান দয়া করে তো ভাল হয়।

বৃদ্ধ বলিলেন, বেশ আজ ছুটির পর গেলেই হবে। তাঁর বাড়ী তো এই কাছেই।

বিদ্যালয়ের ছুটির পর রামপ্রসাদকে সঙ্গে করিয়া বৃদ্ধ শিক্ষকের সঙ্গে লতিকা আশুতোষবাবুর গৃহের উদ্দেশে বাহির হইল। বাড়ীর সংলগ্ন বাগানে তিনি তখন গাছপালার তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। কোন গাছটিতে জল দিতেছিলেন, কোন গাছের তলাকার মাটিটা আল্গা করিয়া দিতেছিলেন, কোন গাছের নীচে পাতা পরিষ্কার করিতেছিলেন। বৃদ্ধ

শিক্ষকের সঙ্গে লতিকাকে দেখিয়া তিনি হাতের কাজ ফেলিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। আশুতোষবাবু নিকটবর্ত্তী গাছের তলায় আসন আনাইয়া তাহাদের বসাইলেন। তারপর নিজেও একটি আসনে বসিয়া বৃদ্ধ শিক্ষকের পানে চাহিয়া বলিলেন, পণ্ডিতমশায়, এইটি বুঝি আমাদের নূতন বড় মা?

পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, আজ্ঞে হঁ্যা। এঁর বয়স অল্প, নতুন জায়গায় এসে ভাবনাও একটু হচ্ছিল—সেজন্য আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে নিয়ে এলাম।

আশুতোষবাবু স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, তার জন্য ভাবনা কেন মা? এখানে তোমার কোন অসুবিধা হবে না।

লতিকা বলিল, আমি এবার আই-এ পাশ করেছি। শিক্ষয়িত্রীর কাজে কোন অভিজ্ঞতা আমার নেই। শিক্ষা সম্বন্ধে আপনার অসীম জ্ঞান। সেজন্য আপনার কাছে উপদেশ নিতে এসেছি যাতে করে আমাকে যে কাজের জন্য নিযুক্ত করেছেন যেন তার উপযুক্ত হতে পারি।

আশুতোষ। তা তুমি হবে মা। তোমার মুখ দেখেই আমি বুঝেছি। তোমার দরখাস্তে তুমি সব কথা প্রকাশ করে লিখেছিলে। তুমি শিক্ষকের মেয়ে। কি করে বাপের যত্নে ও নিজের চেষ্টায় পাশ করেছ—এ সব পড়েই তো আমার মনে হ'ল তুমি এ কাজ পারবে। এখন তোমাকে দেখে সে বিশ্বাস আমার দ্বিগুণ হয়েছে।

লতিকা। শিক্ষা সম্বন্ধে যে সব বই আপনি স্কুলে দান করেছেন সে সব আমি পড়্‌ব। আপনার উপদেশ মত চল্‌ব। মেয়েদের কল্যাণের চিন্তা ও নিজের জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা করব।

আশুতোষ। তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। মনের প্রবল ইচ্ছাই হচ্ছে সব চেয়ে বড় জিনিষ। কাজে থাক্‌লে কাজের পদ্ধতি জানতে দেরী হবে না।

লতিকা। আমাকে আপনি নিজের মেয়ের মত একটু স্নেহের চক্ষে দেখ্‌বেন এই আমার প্রার্থনা।

আশুতোষ। তোমাকে আমি মেয়ের মতই দেখ্‌ব মা; কাজেই একটু স্নেহের চক্ষে দেখ্‌লে তো চল্‌বে না। একটু বেশী যতখানি এই অক্ষম বৃদ্ধের পক্ষে সম্ভব হয়; ততখানি স্নেহের চক্ষেই দেখ্‌ব। তুমি তো জাননা মা কেন ভগবান আমার মত লোকের মাথায় এই নারী প্রতিষ্ঠানের চিন্তা দিলেন।

সন্ধ্যা হয়ে এল। তুমি একটু বস্‌বে চল মা। বৃদ্ধ শিক্ষক বলিলেন, আমার অন্যত্র একটু কাজ আছে এখন। আমি এখন যাই। আবার ঘণ্টাদেড়েক পরে এসে নিয়ে যাব। আশুবাবু বলিলেন, তা যদি সুবিধা হয় আসবেন। না হয় আমি নিজেই মাকে পৌছে দেব।

পণ্ডিত মহাশয় বিদায় লইলেন। আশুবাবু উঠিয়া সম্মুখস্থ পুষ্পপাত্র আনিলেন ও অতিযত্নে মমতার সহিত স্নেহবর্দ্ধিত ফুল গাছগুলি হইতে কতকগুলি ফুল তুলিয়া লতিকার সহিত একটি কক্ষে আসিলেন। কক্ষমধ্যে দেওয়ালে কয়েকখানি তৈলচিত্র ছিল। সর্ব্বোপরি জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি—মায়ের স্নেহ যেন মায়ের সদাপ্রফুল্ল মুখ হইতে শত ধারে ঝরিয়া সমগ্র জগৎকে শান্ত তৃপ্ত করিতেছে। জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তির নীচে দক্ষিণে প্রসন্নানন সৌম্যমূর্ত্তি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিব্যঞ্জক দীপ্তোজ্জ্বল চক্ষু পুরুষমূর্ত্তি। নীচে লেখা—পিতৃদেব। বামে অন্নপূর্ণার মত এক নারীমূর্ত্তি। বক্ষে মুখে

স্নেহ—দয়া দীপ্যমান। নীচে লেখা মাতৃদেবী। এই দুইখানি ছবির নীচে ঠিক মাঝখানটিতে এক কিশোরীর ছবি। বড় কোমল ও সুকুমার মুখখানি। সৌন্দর্য্য যেন আকার ধরিয়া ছবিখানিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছবির নীচে লেখা—মাধুরিমা। প্রত্যেক ছবির নীচে ফুলের আধার ও ধূপ দিবার স্থান।

আশুবাবু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া একে একে সব ছবিগুলির নীচে ফুল দিয়া দীপ ও ধূপ জ্বালিয়া দিলেন। ধীরে ধীরে কক্ষটি পুষ্প ও ধূপের গন্ধে সুরভিত হইয়া উঠিল।

[১৭]

আশুবাবু কিছুক্ষণ ছবিগুলির পানে নিস্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, ছবি দেখেই বুঝতে পারছ মা, কোন্‌খানি কার ছবি। কিন্তু এই নীচের ছবিখানি কার হয়ত বুঝতে পারছ না। এই খানির কথাই তোমায় বল্‌ব।

মাধুরিমা আমার মেয়ে। ঐ আমার একমাত্র মেয়ে। ওকে আমি ছেলেবেলা থেকে নিজহাতে শিক্ষা দিয়ে এসেছি। কিন্তু মায়ের আমার অন্তরে ভগবান যে শিক্ষা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তাই তার যথেষ্ট ছিল। ছেলেবেলা থেকে কারো চোখে জল দেখ্‌লে সে কেঁদে ভাসিয়ে দিত।

একটু বড় হতেই কি করে তাদের দুঃখ দূর করবে এই তার চেষ্টা হয়েছিল। তাকে স্কুলে কলেজে পড়াইনি, নিজে পড়িয়েছিলাম। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত, গণিত, ইতিহাস সব তাকে যতদূর আমার সাধ্য পড়িয়েছিলাম। শিক্ষার আলোক তার সারা মনে কোন কুসংস্কার আনতে পারেনি। শিক্ষা ছিল, কিন্তু তার মনে তার জন্য কোনদিন বিন্দুমাত্র অহঙ্কার আসেনি।

অনেক খুঁজে ভগবানের দয়ায় তার উপযুক্ত পাত্রও পেয়েছিলাম। যেমন শিক্ষিত তেমনি মধুচরিত্র। তাদের দু'জনেরি এই জ্ঞান ছিল যে কর্ত্তব্য শুধু ঘরের ভিতর সীমাবদ্ধ নয়, ঘরের বাহিরেও তার বহু স্থান। এমনি তাহার স্বভাব—এমনি তাহার মন যে, এখানে যেমন সে সকলের প্রাণ ছিল—শ্বশুরবাড়ীতেও ঠিক তেমনি হয়েছিল। শ্বশুর শাশুড়ীর বৌমা-অন্ত প্রাণ ছিল; দেওর ননদ ঠিক যেন ভাই বোনের মত অনুগত ছিল। স্বামী ছিল তার সঙ্গে একেবারে অভিন্ন হৃদয়। এখান থেকে মাকে পাঠাবার সময় আমরা যেমন কাতর হতাম, শ্বশুর বাড়ী থেকে পাঠাবার সময়ে তার শ্বশুর শাশুড়ীও তেমনি কাতর হতেন। মায়েরও এমন কোমল মন ছিল যে, চোখের জল না ফেলে সে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারত না! সবাই তাকে ভালবাসতেন। তার ম্লানমুখ কারও প্রাণে সহ্য হ'ত না। কিন্তু তবু তাকে আমরা দুঃখের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে কেউ পারিনি।

আশুবাবু এই পর্য্যন্ত বলিয়া মাধুরিমার তৈলচিত্রের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। চিত্রের দিকে চাহিয়া লতিকা সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল এমন সৌভাগ্যবতী যে নারী তারও প্রাণে কিসের দুঃখ।

আশুবাবু আবার বলিতে লাগিলেন, মেয়েদের পড়াবার জন্য তার মনে বড় আগ্রহ ছিল। গ্রামের মধ্যে গরীব গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী যেত। যারা মেয়ে তার সঙ্গে পাঠাত তাদের সঙ্গে করে নিয়ে আস্ত। যারা আস্তে দিতে চাইত না, নিয়ম করে তাদের বাড়ী গিয়ে পড়িয়ে আস্ত। তারপর সেই মেয়েদের কাছ থেকেই জান্তে পারত কারা ভাল খেতে পায় না, কার পরবার কাপড় নেই, কার বাড়ীতে কোন্ কষ্ট—কোন দুঃখ আছে কি না। তার নিজের হাতে যে টাকাকড়ি থাকৃত তাই দিয়ে যথাসাধ্য তাদের দুঃখ কষ্ট দূর করত। কোনখান থেকে কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে এসে বলত—বাবা, ওদের বাড়ীতে এত কষ্ট! তার চোখে জল দেখে তাদের দুঃখ দূর করবার জন্য তখনি তার ইচ্ছামত কাজ করতাম। শ্বশুর বাড়ী গিয়েও তার এ অভ্যাসের পরিবর্ত্তন হয়নি। সেখানেও সবাই তার এই অভ্যাসকে স্নেহের চক্ষে দেখ্তে লাগ্লেন। ঠিক এমনি করে মায়ের শ্বশুর বাড়ীতেও একটা পাঠশালা গড়ে উঠ্ল। মেয়েগুলি তাকে দিদি বল্তে অজ্ঞান।

একদিন একটি ছোট মেয়ে তাকে বল্লে তার বৌদিদির মায়ের বড় অসুখ, তিনি নাকি বাঁচবেন না। বৌদিদি দুবছর বাপের বাড়ী যায় নি। বৌদিদির বাবা কতবার নিতে এসে ফিরে গেছেন। মা আর দিদি কিছুতে যেতে দেবেন না। বৌদিদি বলে দিয়েছে আপনি যদি একবার বলেন তাহলে যেতে পারেন। বৌদিদি দিন রাত্রি...

একথা শুনেই মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল। মেয়েটি চলে গেল। মাধুরিমা সজল চোখে শাশুড়ীর কাছে গিয়ে সব বল্লে। তিনি বল্লেন, এ কান্না কেন মা? কি করতে চাও তুমি বল।

চোখ মুছে সে বল্লে, আপনি যদি আমায় নিয়ে ওদের বাড়ী যান মা বৌটিকে একবার দেখে আসব। দুবছর বাপের বাড়ী যায় নি, তার উপর মায়ের এই অসুখ। তবু মা তারা পাঠাচ্ছে না কেন তাই একবার জেনে আস্‌ব।

শাশুড়ী চোখের জল মুছিয়ে তাকে শান্ত করে বল্‌লেন, বেশ তো মা, তাই যাব'খন। তুমি চোখ মুখ ধুয়ে নেও। ঘণ্টাখানেক পরেই আমি তোমাকে নিয়ে বেরুব।

সেখানে গিয়ে বাড়ীর গিন্নির সঙ্গে শাশুড়ী বসে কত কথা কইতে লাগ্‌লেন। মেয়ে দুটি কাছে এসে বস্‌ল। বৌটি ঘোমটা দিয়ে ভয়ে ভয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। মাধুর শাশুড়ী বল্লেন, বৌমা আমার একটু বেড়াতে আর ছোট ছোট বৌঝিদের সঙ্গে কথা কইতে ভালবাসেন তাই নিয়ে এলাম।

কথায় কথায় আরও বল্লেন, বৌমা বাপের বড় আদরের। ২।৩ মাস পরে একবার বাপের কাছে পাঠাতে হয়। তবে সেখানেও তিনি বেশীদিন রাখেন না। তোমার বৌনাটি কতদিন এসেছে দিদি?

দিদিটি তখন পঞ্চমুখী হয়ে বল্লেন, যার যাবার কোন চুলো নেই সে আর যাবে কোথায়? মুখে আগুন ওর বাবা মায়ের।

মাধুরিমা আস্তে আস্তে সরে গিয়ে বৌটিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে দু-চারটে কথা কয়ে নিলে। তারই মধ্যে জেনে নিলে যে, বিয়ের সময় বৌয়ের বাপ যে গহনা দিয়েছিল, তাতে সোণা কম ছিল বলে শাশুড়ী গেয়ে রাখে যে অন্ততঃ দেড়শো টাকা ধরে না দিলে বৌ পাঠাবে না।

উঠে আসার সময় কথায় কথায় মাধুর শাশুড়ী বল্লেন, আপনার বৌটি

তো অনেকদিন হ'ল বাপের বাড়ী যান্‌নি। একবার কেন পাঠিয়ে দিন্ না।

একটু বিরক্ত ভাবে, বৌটির শাশুড়ী উত্তর দিলে—তেমনি করে নিতে আসে তো পাঠাব না কেন? আপনিও যেমন—সে মিন্‌ষে আবার নিতে আসবে!

শাশুড়ীর সঙ্গে মাধু ফিরে এল। পরদিন সেই মেয়েটির কাছে সে খবর পেলে বাপের বাড়ী যাওয়া সম্বন্ধে বৌটি গোপনে কিছু বলেছে এই সন্দেহ করে বৌটিকে কাল শাশুড়ী মেরেছে।

মাধু আর সহ্য কর্‌তে না পেরে শাশুড়ীর কাছে গিয়ে কেঁদে বল্লে, মা বৌটিকে আপনি বাঁচান্। তিনি নিরুপায়। বল্লেন, কি করে বাঁচাব মা, বল। ওরা যদি বলে পাঠাব না আমাদের কি জোর আছে মা? তখন সে বল্লে, মা আপনি যদি রাগ না করেন আমায় আপনি ও বাবা যে টাকা দিয়েছেন তাই থেকে দেড়শো টাকা—বৌটির বাপের কাছে পাঠিয়ে দিন্, ঐ টাকা দিয়ে তিনি মেয়েকে নিয়ে যেতে পারেন।

শাশুড়ী একথা শ্বশুরকে বল্লেন, ঠিকানা জেনে টাকা দিয়ে—কাউকে সেখানে পাঠিয়ে দাও। মা যেন কোন কষ্ট না পান্।

দেড়শো টাকা নিয়ে একজন কর্ম্মচারী বৌটির বাপের বাড়ী গিয়ে দিয়ে এল, আর সব বলে এল। রুগ্‌ণ মায়ের বুকে আশা জাগ্‌ল। বাপ টাকা নিয়ে মেয়েকে নিতে এল। বৌটি চলে যাবে এই ভেবে মাধুরিমা তাকে একটিবার দেখ্‌তে এল। বৌটির মুখে প্রসন্ন হাসি চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু ফুটে উঠ্‌ল।

কিন্তু পরদিন এক ভীষণ খবর এল। বৌটির বাপ দেড়শো টাকা দিয়ে আশা করে বসেছিল যে বিকেলের দিকে সে মেয়েকে নিয়ে যেতে পারবে; কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে বৌটির শ্বশুর বলে বস্‌লো যে এতদিন টাকা পড়ে থাকার জন্য সুদ হয়েছে পঞ্চাশ টাকা। সেই টাকা নিয়ে এলে তবে মেয়ে নিয়ে যেতে পাবে। বৌটির বাপ কত কাকুতি মিনতি কর্‌লে; কিন্তু কিছুই ফল হ'ল না। তারপর সে মেয়েকে বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে চলে গেল। বৌটি মনের দুঃখে সেই রাত্রে আত্মহত্যা করলে।

খবরটি শোনামাত্র মাধুরিমা মাগো বলে অজ্ঞান হয়ে পড়্‌ল। তার পরেই তার ভীষণ জ্বর। সে কি কঠিন অসুখ—আর কি যে কাতর ও কঠিন সবাকার প্রাণপণ চেষ্টা তাকে বাঁচাবার। বাড়ীশুদ্ধ সবাই সব কাজ ফেলে তাকে নিয়ে রইল। আমি স্ত্রীকে নিয়ে সেখানে গিয়ে রইলাম। শ্রেষ্ঠ ডাক্তার নিয়ে আসা হল। কিন্তু সব বিফল। কি আঘাত যে তার মনে লেগেছিল যে তা আর সে সাম্‌লাতে পার্‌লে না।

মা আমার সংসার থেকে বিদায় নেবার আগের দিন আমাকে ডেকে বল্লে, বাবা, তোমায় একটী কথা বল্‌তে আমার ইচ্ছে করছে। আমি তার মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে বল্লাম, কি কথা বল মা। অনেক কষ্টে—অনেকবার থেমে থেমে সে আমায় এই শেষ কথাকয়টী বলে গেল।

"বাবা আমি লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে বৌঝিদের সঙ্গে মিশে দেখেছি তাদের মনের অবস্থা বড় নীচু। বেশীর ভাগ মেয়ের একটা

ভাল জিনিষ ভাববার সময়, সুযোগ বা যোগ্যতা কিছুই নেই। দশ বছরের বৌ বাড়ী নিয়ে এসে তার কাছে কুড়ি বছরের বুদ্ধি, শক্তি ও কাজ চায়। না পেলেই যন্ত্রণা দেয়। মনেও করে না তার নিজের বাড়ীর দশ বছরের মেয়ে কতখানি পারে। আরও আশ্চর্য্য এই যে বাড়ীর পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই যন্ত্রণা দেয় বেশী। ভাল শিক্ষা যদি এরা একটু পায় এদের জীবন অন্যপথে যায়। রামায়ণ মহাভারত বুঝে পড়্‌তে পারলেও প্রাণে কত শান্তি পায়। মাকে দুঃখ দিতে হলেই প্রাণ কাঁদে। তাহলে দুঃখ সহ্য করবার শক্তি বাড়ে—দুঃখের সময়ও শক্তি আসে। যে বৌটি দুঃখ সহ্য কর্‌তে না পেরে আত্মহত্যা করলে সে লিখ্‌তে পড়্‌তে জানত না। জান্‌লে মা বাবাকে স্বামীকে চিঠি লিখে জানাতে পারত। দুঃখের মাঝেও একটু সান্ত্বনা পেত। তার শাশুড়ী ননদ যারা তাকে এত কষ্ট দিত তারাও নিরক্ষর। ভাল চিন্তা—ভাল ভাব তাদের মনে কখন আস্‌ত না, তাই তারা এত নিষ্ঠুর হতে পেরেছিল। এই বৌটি যদি আমার শাশুড়ীর মত শাশুড়ী পেত তাহলে কি তাকে এ দুর্গতি ভোগ করতে হয়!

তাকে ওকথা আর ভাবতে নিষেধ করতে সে বল্‌লে—আমি আর ওসব কথা বল্‌ব না। কিন্তু মরবার আগে তোমার কাছে এই প্রার্থনা করে যাচ্ছি বাবা, যাতে আমাদের দেশে সব মেয়েরা লেখাপড়া শিখ্‌বার সুযোগ পায় তুমি তার জন্য অন্তরের সঙ্গে চেষ্টা কর। তুমি যদি এইটি কর বাবা, যেমন জীবনে আমি চিরদিন সুখে ছিলাম মরণেও আমি তেমনি সুখে থাক্‌ব। আর কত সংসারের অশান্তি ঘুচে যাবে—কত মেয়ের দুঃখ তোমা হতে দূর হবে।

আমি বললাম, হ্যাঁ মা, তোমার কথামত সব হবে। তুমি সেরে ওঠ; আমরা সবাই মিলে এই কাজ করব।

তবু সে বল্‌লে, যদি আমি না বাঁচি, বাবা, তবুও করবে তো?

চোখে জল এল। তবু বল্‌লাম, হ্যাঁ মা, করব।

মাতার সজল চোখে হাসির আভা ফুটে উঠ্‌ল। আমাদের সবারি চোখে জলের ধারা নেমে এল। তার পরদিন মা আমার পৃথিবীর খেলা সাঙ্গ করে চলে গেল। তার শ্বশুর শাশুড়ী এখনও সে শোক ভুল্‌তে পারেননি। তার স্বামী সন্ন্যাসীর মত হয়ে আছে। তার মা এ শোক সহ্য করতে না পেরে কয়েক মাসের মধ্যেই তার কাছে চলে গেছেন।

এখন বোধ হয় বুঝ্‌তে পারছ মা, মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া, মেয়েদের এতটুকুও উন্নতির সহায় হওয়া আমার কতখানি প্রাণের কাজ। আমার জামাই বেহাই তাঁদের দেশে দুটি বালিকা বিদ্যালয় খুলেছেন। আর আমার এই জীবনের ব্রত। এতেই আমার তৃপ্তি, আনন্দ—এতেই আমার শান্তি।

আশুবাবু চুপ করিলেন। তাঁহার কাহিনীর কারুণ্য, মাধুর্য্য ও পবিত্রতায় যেন গৃহখানি ভরিয়া রহিল। ধূপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া গন্ধ বিকিরণ করিতে লাগিল, মাতার সুখের স্মৃতির মত পুষ্পের সৌরভ কক্ষমধ্যে জাগিয়া রহিল। লতিকার মনে হইল মাধুরিমার স্নিগ্ধমুখর আঁখি দুটি হইতে যেন স্নেহ, প্রীতি ও কারুণ্য উছলিয়া পড়িতেছে।

অমর লতিকার শিক্ষয়িত্রীর কাজের কথা লতিকার পত্রেই অবগত হইয়াছিল। রামপ্রসাদ সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল।

লতিকা লিখিয়াছিল, আমি যে মাকে ভাই বোন্‌দের কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারিব সেইটুকুই আমার পরম শান্তি। তবে একেবারে একা থাকা এক এক সময়ে বড় কষ্ট হয়। তখন মনে মনে ভাবি চিরদিন যে একা থাকিতে হইবে ইহা তাহারই প্রারম্ভ মাত্র। বাবা চলিয়া গিয়াছেন, মাও হয়ত অতর্কিতে একদিন চলিয়া যাইবেন। তুমি দূরে—হয়ত বা একদিন আরও দূরে চলিয়া যাইবে।

অমর খুব সংক্ষেপেই তার উত্তর দিয়া লিখিল যে ভবিষ্যতে সে কতখানি দূরে চলিয়া যাইবে তাহার উত্তর ভবিষ্যৎই দিতে পারিবে। মানুষের সে সম্বন্ধে অহঙ্কার করা বৃথা এবং জোর করিয়া কিছু বলাও কঠিন।

*   *   *   *

দিন কাটিতে লাগিল। কণিকা ও রামপ্রসাদ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিল। অমর এম-এ, বি-এল পাশ করিয়া পিতার চেষ্টায় সহজেই ডাকঘরের Superintendentএর পদ পাইল।

চন্দ্রনাথ সংবাদ পাইলেন যে লতিকা শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতেছে এবং বিবাহ করিবে না এই সংকল্প প্রকাশ করিয়াছে।

অমরের বিবাহ চন্দ্রনাথবাবু একপ্রকার স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল লতিকার বিবাহ অন্যত্র হইয়া গেলে অমরের বিবাহ দিবেন। লতিকার সংকল্পের কথা শুনিয়া তিনি অমরের বিবাহের কথাবার্ত্তা সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারিলেন না। ভাবিলেন অমর বড় হইয়াছে—একবার তাহার মত জানা প্রয়োজন।

পূজার ছুটিতে অমরের বাড়ী আসিবার কথা। চন্দ্রনাথ ভাবিলেন এই সময়ে 'বাগীশকে' আনাইয়া অমরের মত জানিতে পারিলে ভাল হয়। 'বাগীশ' তখন কলিকাতায় ছিল না। অত্যন্ত ধনী ও বিখ্যাত জমিদার বংশের ছেলে বলিয়া সে বি-এ পাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পাইয়াছিল। বাগীশকে তিনি একখানি চিঠি লিখিলেন যে বিশেষ প্রয়োজনে সে যেন অন্ততঃ একটী দিনের জন্যও একবার আসে।

বাগীশ আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন অমরের বিবাহের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে কি না। বাগীশ সব কথাই জানিত। সে বলিল, লতিকা বিবাহ করিতে অনুমতি দিলে সে সানন্দে সম্মত হইবে। তবু অমরকে আর একবার জিজ্ঞাসা করা ভাল।

চন্দ্রনাথ বলিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করেছি না ব'লে তুমি নিজে জিজ্ঞাসা করছ এই ভাবে কথাটা বোলো।

বাগীশ সেই ভাবেই জিজ্ঞাসা করিয়া চন্দ্রনাথকে বলিল, অমর বলে যে অন্যত্র বিবাহে সে সারাজীবন অসুখী হইবে।

অমরের পিতামাতার মধ্যে অনেক কথাই হইল। শেষে চন্দ্রনাথ স্থির করিলেন, তিনি নিজে হইতে কৌলীন্য ভঙ্গ করিয়া বিবাহ দিতে মত প্রকাশ করিবেন না! কিন্তু অমর যদি স্থির করে তো লতিকাকে বিবাহ করিতে পারে। ইহাতে সে তাঁহার বিরাগ-ভাজন হইবে না।

বাগীশ এই কথা অমরকে বলিলে অমর বলিল যে, পিতার আন্তরিক ইচ্ছা না জানিলে এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ না পাইলে সে লতিকাকেও বিবাহ করিতে চাহিবে না। তবে লতিকা ব্যতীত আর কাহাকেও সে স্বেচ্ছায় বিবাহ করিবে না ইহাও স্থির।

ইহার পরে দুই বন্ধুতে অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

বাগীশ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, লতিকা যদি ইহার মধ্যে আর কাউকে বিয়ে করে।

অমর বলিল, লতিকা আর কাউকে বিয়ে করবে না। বাগীশ বলিল, তর্কের খাতিরেই ধর যদি করে?

অমর বলিল, তাহলে বাবা যেখানে বল্‌বেন সেখানেই বিয়ে করব।

বাগীশ বলিল, তুমি কি সত্যই মনে কর একবার যাকে বিয়ে করতে চায় তাকে ছাড়া অপরকে পুরুষ বা নারী কিছুতে বিয়ে করে না!

অমর। একেবারে করে না সে কথা বল্‌ছিনে। তবে করে না এমনও অনেক আছে।

বাগীশ। আচ্ছা, অদর্শনে ভালবাসা বাড়ে না কমে?

অমর। সে ভালবাসা হিসাবে।

বাগীশ। তার মানে ?

অমর। সত্যকার ভালবাসা হলে বাড়ে, নইলে কমে।

বাগীশ। আচ্ছা ধর, তুমি আর আমি দুজনেই একই জনকে ভালবাসি। আমি প্রবাসে রয়ে গেলাম, তুমি গেলে সে থাকে যেখানে। ধীরে ধীরে তুমি যাওয়া আসা করতে লাগ্‌লে। ক্রমশঃ তুমিই তার মন অধিকার করলে। আমি দূরে থেকে আরও দূরে চলে গেলাম।

অমর। এটা তোমার ফাঁকির তর্ক হল। আসল কথাটাই তুমি বাদ দিয়ে গেলে। বল্‌লে আমরা দুজনেই একজনকে ভালবাসি। সে একজন যে কাকে ভালবাসে তা তো বল্‌লে না।

বাগীশ। ধর সে তোমাকেই একটু বেশী ভালবাসে, কিন্তু আমাকেও একেবারে ঘৃণা করে না।

অমর। যদি আমাকে সে সত্য করে ভালবাসে—তাহলে তোমার সঙ্গের চেয়ে আমার স্মৃতিই তার বেশী ভাল লাগ্‌বে।

বাগীশ। ওটা হ'ল কাব্যের কথা। বস্তুতন্ত্রে ওকথা বলে না।

অমর। বস্তুতন্ত্রে কি বলে ?

বাগীশ। বলে যখন যার কাছে থাকি তখন তার মন রাখি; কিংবা out of sight, out of mind—চোখের বা'র হলেই মনের বা'র। আদর্শের দাম আদর্শ হিসেবে। বস্তুজগতে তার কোন স্থান নেই।

অমর। এ সব নিজের মনে অনুভব করবার বিষয়, অপরকে বোঝাবার বিষয় নয়। তুমি যাকে বস্তুতন্ত্র বল : সেইটে উদ্ভ্রান্ত

কর্‌লেই কোন জিনিষকে প্রমাণ করা হল না এবং তা বিশ্বাস করা চলে না।

বাগীশ। আচ্ছা আমি যদি কার্য্য দ্বারা একে প্রমাণ করে দিতে পারি ?

অমর। তাহলে বিশ্বাস কর্‌ব এবং মত বদ্‌লাব।

ইহার পর দুইজনে এই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিল। দুই দিন থাকিয়া বাগীশ চলিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে অমরের পিতাকে অমরের মনোভাব বলিয়া গেল।

অমর লতিকাকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিতে চায় না ইহা বুঝিয়া চন্দ্রনাথবাবু দুঃখের সহিত বলিলেন, বংশমর্য্যাদার মমতা আমার অস্থি মজ্জায় মিশে আছে। আমি তাকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে পারব না। আমি অমরকে স্বাধীনতা দিচ্ছি। কিন্তু প্রসন্নচিত্তে অনুমতি দিতে পার্‌ব না।

বাগীশ অমরকেও এ কথা বলিয়া গেল।

আশুবাবুর বাহিরে যাইবার সময় আসিল। এবার তিনি লতিকার হাতে ঘর বাড়ীর ভার দিয়া গেলেন। সেই সময়ে লোকেন্দ্রবাবু বলিয়া এক নূতন সব্‌ডিভিসনাল অফিসার আসিয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। সমগ্র লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ দেখিয়া তাঁহারি হাতে তিনি বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া গেলেন। লতিকাকে বলিয়া গেলেন সে যদি তাহার মা ও ভাইবোন্‌দের এখানে আনে তাহা হইলে সে যেন অসংকোচে এই বাড়ীতে আসিয়া বাস করে। তাঁহার লোকজনদেরও তিনি এই মর্ম্মে উপদেশ দিয়া গেলেন। আশুবাবু লোকেন্দ্রবাবুর সহিত লতিকাকে পরিচিত করিয়া দিলেন।

ক্রমে লতিকার সহিত লোকেন্দ্রবাবুর বেশ পরিচয় হইল। মাঝে মাঝে তিনি বিদ্যালয়ে আসিতে লাগিলেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে লতিকার অনেক আলোচনা চলিতে লাগিল। লতিকা ইদানীং আপনার অভিজ্ঞতা, আশুবাবুর উপদেশ ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী পড়িয়া—স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিল। লোকেন্দ্রবাবুর সঙ্গে ইহা লইয়া সে অসংকোচে আপনার মতামত প্রকাশ করিতে লাগিল।

সেদিন স্কুলের পুরস্কার বিতরণের দিন ছিল। মেয়েদের আবৃত্তি বড়ই মধুর হইয়াছিল এবং সকলকেই নিরতিশয় তৃপ্ত করিয়াছিল। লোকেন্দ্রবাবু অনেকগুলি পুরস্কার নিজ ব্যয়ে মেয়েদের দিয়াছিলেন। পুরস্কার বিতরণের অব্যবহিত পরে তিনি সভাস্থলে লতিকার অজস্র প্রশংসা করিয়া তাহার বুদ্ধি, বিদ্যা, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা ও শিক্ষাপদ্ধতি তদুপরি তাহার চরিত্র মাধুর্য্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন। সন্ধ্যার সময় মেয়েরা সব পুরস্কার ও মিষ্টান্নাদি লইয়া গৃহে ফিরিল। অভ্যাগতেরা এক এক করিয়া বিদায় লইলেন। লোকেন্দ্রবাবু সবশেষে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। লতিকা বলিল, আপনি সেই কখন এসেছেন। একটু যা হয় কেন খেয়ে যান্ না।

লোকেন্দ্রবাবু বলিলেন, আপনিও তো ক্লান্ত। আপনারও এখন বিশ্রামের দরকার। একেবারে বাসায় গিয়া খাব।

লতিকা বলিল, তা হলে এক পেয়ালা চা খেয়ে যান্। চায়ের সময় তো আপনার পেরিয়ে গেছে।

লোকেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, চায়ের সময় আমার পেরুবার ভয় নেই—কারণ ও উপসর্গ আমার নেই। তবে আপনি যদি অনুমতি দেন, আপনার সঙ্গে আর একটু গল্প করে যাই।

লতিকাকে বলিতে হইল, বেশ তো গল্প করুন্ না! তবে একটু মিষ্টি মুখ করে।

লোকেন্দ্রবাবু বলিলেন, আচ্ছা তা হলে ঘরে যা আছে তাই নিয়ে আসুন। কিছু তৈরি করতে পাবেন না কিন্তু।

ঘরে সামান্য কিছু ফল ছিল। লতিকা তাহাই কাটিয়া একটি

রেকাবিতে সাজাইয়া তাহার সঙ্গে এক টুক্‌রা মিছরি দিয়া লোকেন্দ্রের সম্মুখে রাখিল। ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, এমনি অদৃষ্ট, ঘরে আজ আর কোন মিষ্টিই নাই।

লোকেন্দ্র বলিলেন, ফলের মধ্যে মিষ্টতা আছে, মিছরি তো মিষ্টই; আর সব চেয়ে মিষ্ট আপনার কথা ও পরিবেশন। তবু আপনার ক্ষোভ!

কথা কয়টা এমন বিশেষ কিছুই নয়। হয়ত ইহা মাত্র শিষ্টাচারের কথা, হয়ত বা তাহাও নহে। তথাপি লতিকা একটু শঙ্কিত হইয়া পড়িল। সামান্য কথা হইতেই কত অসামান্য কথা উঠিয়া পড়ে। লতিকা নীরবে বসিয়া রহিল, উত্তরে কিছুই বলিল না।

লোকেন্দ্র সব কয়খানি ফল শেষ করিয়া মিছরিটুকু মুখে ফেলিয়া দিলেন। মিছরি শেষ হইলে একটু জলপান করিয়া একটি পান লইলেন। পরে কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন, যদি অনুমতি দেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

লতিকা ভয়ে ভয়ে বলিল, বলুন।

লোকেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আপনি কি কুমারী থাকবেন স্থির করেছেন?

লতিকাকে লজ্জিত ও নিরুত্তর দেখিয়া তৎক্ষণাৎ লোকেন্দ্র বলিলেন, আপনি এতে কোন দোষ নেবেন না। আমার এ প্রশ্নের মধ্যে বিন্দুমাত্র অসম্মান নেই।

লতিকা ধীরে ধীরে বলিল, আমি কুমারী থাকাই স্থির করেছি।

লোকেন্দ্র একটু আবেগের সহিত বলিল, আমাকে এক মিনিটের জন্য একটা কথা বলার জন্য অনুমতি দয়া করে দিন্।

লতিকা নতমুখে বসিয়াছিল। মুখ তুলিয়া বলিল, বলুন্।

লোকেন্দ্র বলিয়া গেল—আমি আপনার প্রতি অনুরক্ত; যেদিন থেকে আপনাকে দেখেছি সে দিন থেকে। আমি অবিবাহিত থাকারই সংকল্প করেছিলাম। আপনাকে দেখে—আপনাকে জেনে সে সংকল্প ভেসে গিয়েছে। আপনার সব সন্ধান নিয়েছি। জেনেছি বিবাহে কোন বাধা নেই। আপনাকে পাবার প্রত্যাশা করতে পারি কি?

লতিকা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে বলিল, আমাকে ওকথা বল্‌বেন না।

লোকেন্দ্র বলিলেন, আমি আপনাকে দেখ্‌তে পেলেও মাঝে মাঝে কথা কইতে পেলেই যথেষ্ট মনে করতাম, আপনার কাছে আমার মনের এ দুরাশা কখন প্রকাশ করতাম না। কিন্তু হয়ত পরে এর জন্য আপনার কোন নিন্দা হতে পারে, সে জন্য যোড় করে আপনাকে প্রার্থনা করি। যদি আপনি অপরের অনুরাগিণী না হন্ এবং আমাকে ঘৃণা না করেন তা হলে আমাকে গ্রহণ করুন।

লতিকা এতক্ষণ নতমুখে বসিয়াছিল। এবার তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলিয়া বলিল, আপনার মত সর্ব্বগুণান্বিত লোককে ঘৃণা কে করতে পারে? এমন স্বামী পাওয়া যে কোন নারীরই সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি অপরের অনুরাগিণী।

লোকেন্দ্র একটু ভাবিয়া বলিলেন, তবে আপনি যে বল্লেন আপনাকে কুমারীই থাকৃতে হবে।

লতিকা বলিল, সে কথাও সত্য। তাঁকে লাভ করা আমার অদৃষ্টে নেই।

লোকেন্দ্র ক্ষুব্ধ আবেগের সহিত বলিলেন, তা হলে কেন আমাকে বিমুখ কচ্ছেন? যে আপনাকে হতাদর করবে তার অপেক্ষায় আপনি চিরজীবন বসে থাক্‌বেন, আর যে আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে চাইবে তাকে আপনি নিরাশ করবেন!

লতিকা ধীরে ধীরে বলিল, তিনি আমাকে একটুও হতাদর করেননি। কিন্তু তিনিও আমার মত নিরুপায়। তিনিও আজ পর্য্যন্ত বিবাহ করেননি, আর বোধ হয় করবেনও না।

লোকেন্দ্র হঠাৎ পরিহাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, আর যদি তিনি অন্য কাউকে বিয়ে করেন তা হলে আপনিও অপরকে বিয়ে করতে রাজী হবেন তো?

লতিকা এবার দৃঢ়-স্বরে বলিল, না—তা হলেও নয়।

লোকেন্দ্র তথাপি বলিলেন, কেন নয়?

লতিকা বলিল, এর কারণ নির্দ্দেশ করতে আমি অক্ষম।

লোকেন্দ্র বলিলেন, কেন পারবেন না? আপনারা দুজনে দুজনকে ভালবাসেন এবং শীঘ্র হোক্ বা কিছুদিন পরেই হোক্—আপনাদের বিবাহ হবে, কাজেই আপনি অপরকে গ্রহণ করতে পারেন না।—এর অর্থ বেশ বুঝ্‌তে পারি এবং এর বিরুদ্ধে আপনাকে কিছু বল্‌বারও নেই। কিন্তু তিনি আপনাকে ভালবেসে অপরকে বিবাহ করবেন, আর আপনি তারই কথা ভেবে জীবন কাটাবেন, আর কেউ আপ্‌নাকে প্রার্থনা করলে তার পানে ফিরেও চাইবেন না—এ আমাকে অপমান করা ছাড়া কিছুই নয়।

লোকেন্দ্রের এবারকার স্বর একটু কঠিন।

লতিকাও ইহাতে একটু অপমানিত জ্ঞান করিল। সে দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, এ প্রসঙ্গে আর প্রয়োজন নেই। এ ত্যাগ করুন।

লোকেন্দ্র আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। সে কক্ষ ত্যাগ করিতে করিতে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই আপনার শেষ উত্তর তো?

লতিকা উত্তরে শুধু বলিল, 'হাঁ'।

লোকেন্দ্র বলিলেন, এ অপমানের যদি আমি প্রতিশোধ নিই —তবু?

লতিকা উত্তর দিল—হাঁ, তবু।

লোকেন্দ্র আর একবার লতিকার পানে চাহিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

এক সপ্তাহ পরে লোকেন্দ্রবাবুর লোক আসিয়া লতিকার নামে একখানি খামের চিঠি দিয়া গেল। লতিকার মনে হইল হয়ত বা ইহার মধ্যে তাহার চাকরির জবাবই আছে। উদ্বিগ্ন ভাবে খামখানি খুলিতে তাহার ভিতর দুইখানি পত্র পাইল। প্রথম খানি লোকেন্দ্রবাবু বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি ও সভাপতি হিসাবে তাহাকে পূর্ণ বেতনে একমাসের ছুটি দিয়াছেন। তাহাতে লিখিয়া দিয়াছেন আজ হইতে এক সপ্তাহের মধ্যে যেদিন তাহার আত্মীয় আসিবেন সেইদিন হইতে সে ছুটি লইতে পারিবে। অপর খানি পত্র হিসাবেই লেখা। তাহাতে লিখিয়াছেন, লতিকাদেবী, সেদিনকার কথায় আমি আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হই নাই। তাহাতে আপনার উপর আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে। সেদিন যাহা কিছু অন্যায় বলিয়া থাকি তাহার জন্য করপুটে আমি মার্জ্জনা চাহিতেছি।

পত্র পড়িয়া লতিকা অপার বিস্ময়ে নিমগ্ন হইল। কেন তাহাকে ছুটি দেওয়া হইল, কে তাহাকে লইতে আসিবে—ইহার কিছুই সে স্থির করিতে পারিল না। পূর্ব্বে হইলে সে চিঠি লিখিয়া—লোকেন্দ্র-বাবুর কাছ হইতে ইহার কারণ জানিয়া লইত। একবার ভাবিল, ইহা কি তাহাকে এই ভাবে সরাইয়া দিয়া অন্য কাহাকেও এই কাজে নিযুক্ত করিবার উপায়? তাহাই যদি হইবে তাহা হইলে এত

ঘুরাইয়া এ কাজ করিবার কি প্রয়োজন? সাদা কথায় বলিয়া দিলেই হইত—তোমার প্রয়োজন নাই।

সারারাত্রি ভাবিয়া ভাবিয়া লতিকা ইহার কোন সঙ্গত কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। সকালে উঠিয়াও যখন সে ঐ কথাই ভাবিতেছিল—তখন একখানি ঘোড়ার গাড়ী তাহার বাসার সম্মুখে আসিয়া থামিল। গাড়ী করিয়া হঠাৎ এ সময়ে কে আসিল, তাহা দেখিবার জন্য তাহার উৎসুক দৃষ্টির সম্মুখে যখন অমর গাড়ী হইতে নামিল, তখন তাহার আর বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। লতিকার পায়ে পায়ে যেন বাধিয়া আসিতেছিল; তথাপি দুরু দুরু হৃদয়ে ছুটিতে ছুটিতে বাহিরে আসিল। অমরের সঙ্গে যখন সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল তখন তাহার হৃদয়ের দুরু দুরু শব্দে সে নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হইতেছিল।

প্রথম কথা কহিল অমর—ভাল আছ, লতু?

লতিকা—অমরের প্রসন্ন সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া—শুধু একটিবার ঘাড় নাড়িয়া তাহাকে প্রণাম করিতে গেল। সামান্য 'হাঁ' কথাটাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

অমর নীচু হইয়া লতিকাকে তুলিয়া ধরিল ও তাহার অনুরাগ-ভরা চোখের পানে চাহিয়া বলিল, বাবা এতদিন পরে প্রসন্নচিত্তে বিয়েতে মত দিতেছেন। তাই আমি তোমাকে নিতে এসেছি!

লতিকা আনন্দে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া লুটাইয়া পড়িতেছিল। অমর তাহাকে বাহুপাশে ধরিয়া ফেলিল।

অপরাহ্নে অমর ও লতিকা পাশাপাশি বসিয়া কথা কহিতেছিল। বাহির হইতে লোকেন্দ্রবাবু হাঁকিলেন, ভিতরে আস্‌তে পারি? লতিকা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। লোকেন্দ্রবাবু অমরকে দেখিয়া যেন অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, মাফ কর্‌বেন। আমি জানতাম না। আচ্ছা লতিকাদেবী, ইনিই কি তিনি যিনি আপনারই মত নিরুপায়?

অমর জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে—জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

লোকেন্দ্র বলিলেন, খুব পারেন। আমি—ওস্‌মান। তবে আমি যুদ্ধ না করেই তিলোত্তমার দাবী ছেড়ে দিচ্ছি।

অমর হাসিয়া ফেলিল। বলিল, বেশ তাহলে বসুন।

লোকেন্দ্র হাসিমুখে বসিলেন। অমর লতিকার পানে চাহিয়া বলিল—তুমি একে চিন্‌তে পারনি?

লতিকা কিছু বুঝিতে না পারিয়া অসহায়ের মত চাহিয়া রহিল।

অমর বুঝাইয়া বলিল—তুমি বাগীশের নাম শুনেছ ত? এই সেই বাগীশ। লোকেন্দ্র এর একেবারেই পোষাকী নাম; এতদিন বাক্সে তোলা ছিল। এর চিঠি পেয়েই তো আমি আস্‌ছি।

লোকেন্দ্র বলিল, ইনি তো আগের কথা জানেন না। এটুকু বল্‌লে উনি কি করে বুঝবেন?

অমর তখন বলিল, বাগীশকে দিয়ে বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে বিয়েতে আমার মত আছে কি না। বাগীশকে আমি বলি যদি বাবার মত হয় তো তোমাকে পেলে আমি কৃতার্থ হই। আর যদি তাতে বাবার মত না হয় তাহলে বিবাহ করব না। তাতে বাবা বলেন, আমার যদি ইচ্ছা হয় আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারি। তবে তিনি নিজে থেকে এ বিবাহে সম্মতি দিতে পারবেন না। আমি তখন বলি যে বাবার সম্পূর্ণ সম্মতি না পেলে আমি বরং চিরকাল অবিবাহিত থাকব। এই সব নিয়ে বাগীশের সঙ্গে তর্ক হয়। ও বলে, অদর্শনে ভালবাসা কমে এবং প্রিয়-জনের বহু-কাল অদর্শনের মধ্যে যদি আর কেউ আসে তাহলে তার প্রিয়ের স্থলাভিষিক্ত হতে বেশী দেরী হয় না। আমি বলি, সত্যকার অনুরাগ থাকলে অদর্শনে তা বাড়ে বই কমে না। বাগীশ জিজ্ঞাসা করে, যদি তুমি অন্য কাউকে বিয়ে কর তাহলে আমি অন্যত্র বিবাহে রাজী আছি কি না। আমি বলি, লতিকা কিছুতেই অপর কাউকে বিয়ে করবে না। যদি করে তাহলে অন্য বিয়েতে আমার কোন আপত্তি নেই।

লোকেন্দ্র বলিলেন, এবার তাহলে 'অমরনাথের কথা' হোক্।

তারপর লতিকার পানে চাহিয়া বলিলেন, এই জন্য লোকেন্দ্র আপনার কাছে কোন দিন 'বাগীশ' হয়নি এবং কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আপনার পাণিপ্রার্থী হয়েছিল। তবে আপনারই সম্পূর্ণ জয় হয়েছে। আমি আপনাকে প্রণাম করি। অমরেরই জয়জয়কার। অমরের বাপেরও একটু আশা ছিল হয়ত আপনি অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারেন যখন আপনার কাছে আমি শেষ উত্তর পেলাম অমরের বাপকে সব কথা

লিখে পত্র দিলাম। অনেক করে তাঁকে অনুরোধ করলাম তিনি যেন আপনাদের দুজনের বিবাহে আর বাধা না দেন এবং সম্পূর্ণ অনুমতি দেন। এর পরেই তিনি মত পরিবর্ত্তন করে অমরকে ডাকিয়ে আনন্দের সঙ্গে অনুমতি দেন।

অমর বলিল, বাবা তখন আমাকে আশীর্ব্বাদ করে বল্লেন মাষ্টার মশায়ের স্ত্রীকে আজই গিয়ে এ খবর দিয়ে লতুকে এনে তাঁর কাছে পৌঁছে দাও। আমি সেই দিনই গিয়ে তাঁকে সব কথা বলি।

স্যারের নূতন বড় ছবিখানিও তাঁকে দিয়ে এসেছি। সেই দিনই ইতিহাসের প্রকাশকদের কাছ হতে পত্র আসে যে—এ বৎসরে সেই বই হতে তাঁর অংশে এক হাজার টাকা প্রাপ্য হয়েছে, কি ভাবে এবং কোথায় টাকা পাঠাতে হবে জান্‌লেই তারা টাকা পাঠাবে।

সেই পত্র পড়ে আর স্যারের সেই ছবি দেখে খুড়িমার সে কি কান্না! সে কান্না চিরদিন আমার মনে থাক্‌বে। তাঁকে কত করে শান্ত ক'রে তবে এসেছি।

এ কথায় তিন জনেরই চোখে জল আসিল।

অপরাহ্ণে লতিকাকে লইয়া অমর সেখান হইতে বাহির হইল। লোকেন্দ্র আসিয়া তাহাদের ট্রেণে উঠাইয়া দিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে লতিকা ও অমর দুর্গাপুরে আসিয়া পৌঁছিল।

দুইজনে একসঙ্গে মায়ের চরণ বন্দনা করিয়া যখন প্রাচীর বিলম্বিত মনোহরের তৈলচিত্রের সম্মুখে নত হইয়া প্রণাম করিল, তখন মনে হইল যেন চিত্রে মনোহরের প্রশান্ত মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল

এবং তাঁহার নির্ম্মল নয়ন দুটি হইতে আশীর্ব্বাদের অমৃত ধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

মরণে মনোহরের প্রেম অমর হইয়া উঠিল।

জীবনের সকল বিফলতা বুঝি এমনি মরণে সফল হইয়া উঠে!

—শেষ—